মন যায় যমুনায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৮ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীকিঙ্কর কুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৬ ।

শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রীতিভাষণেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

সেই অজানার খোঁজে
খনির নতুন মণি
ঝংকার
রূপের হাটে বিকিকিনি
মেঘের মিনার
সিকেপিকেটিকে
অপরিচিতের মুখ
দুটি প্রতীক্ষার কারণে
আনন্দরূপ
কাল তুমি আলেয়া
শিলাপটে লেখা
একজন মিসেস নন্দী
রাগশন

জানালার ধারে
পঞ্চতপা
অন্য নাম জীবন
উত্তর বসন্ত
বিদেশিনী
সাঁঝের মাল্লিকা
নিষিদ্ধ বই
নগশৃঙ্গার
শ্রেষ্ঠগল্প
বলাকার মন
কারণে অকারণে
রাধাচূড়ার বাঁশী
তোমার জন্য
চলাচল

আবার আমি আসব
প্রতিহারিণী
যার সেথা ঘর
নগর পারে রূপনগর
শতরূপে দেখা
মালবী মালঞ্চ
সমুদ্র সফেন
ফেরারী অতীত
কাঞ্চন রাগিণী
ঘর
একাকী জোনাকি
আমি সে ও সখা
নগর দর্পণে
সাবরমতী
দুজনার ঘর
অহকাতিলকা
সাত পাকে বাঁধা
রাপ্তির ডাক
চলো জঙ্গলে যাই
বকুল বাসর
স্বয়ংবৃতা
রোসয়নাই
নব নায়িকা
মন মধুচন্দ্রিকা
সারি তুমি কার
পরিণায় মঙ্গল
সোনার কাঠি
রূপোর কাঠি

মন যায় যমুনায়

মন যায় যমুনায়

মন যায় যমুনায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মন যায় যমুনায়

১

চন্দ্রা নারায়ণের চোখের সামনে সেই আর একটা দিনের মতো কত কি ভিড় করে আসছে।...খবরের কাগজে ছোট বড় মাঝারি হরফে কি-সব লেখা। পাশে তারই ছবি, তারই মুখ। তারই সম্পর্কে কত কি লেখা। তাকে নিয়ে কত কি বিস্ময়। তার ছাত্র জীবনের কথা। কর্ম জীবনের কথা পেশায় একাগ্র নিষ্ঠার কথা। তার ঘর-সংসারের কথা। তার সম্পর্কে পদস্থজনের অভিমত, মন্তব্য। সব তার অনুকূল। অনুকূল বলেই এত বিস্ময় আর এত গবেষণা তাকে নিয়ে। কিন্তু সব—সব দুর্বোধ্য লাগছিল চন্দ্রা নারায়ণের।

আজও অনেকটা তাই।

আসামীর কাঠগড়া। সেখানে চন্দ্রা নারায়ণ দাঁড়িয়ে। সামনের উঁচু আসনে বিচারক। তিনি টাইপ করা কাগজ দেখে কি পড়ছেন, কি বলছেন -- এক বর্ণও কানে যাচ্ছে না। চন্দ্রা নারায়ণের সামনে ডাইনে বাঁয়ে সারি সারি মুখ চেনা। অচেনা।...ওই তার স্বামী জিত্‌ নারায়ণ। তার পাশে ন' বছরের ছেলে বাচ্চু। রোজ তাদের ওই একই জায়গায় দেখে আসছে। এই বিচার মঞ্চের বোবা দর্শক তারা। আজও দেখছে। আজ তাদের চোখে মুখে জোরালো আশা।...সেই সঙ্গে রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে চন্দ্রা নারায়ণের। পায়ের নিচে মাটি সরছে নড়ছে দুলছে কাঁপছে। আজ অনেক দিন বাদে এই মুখের মিছিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার যেন থেকে থেকে ঘুমও পাচ্ছে। এখানে এই দিনমানে ঘুমের কথা ভাবতেও হাসি পেয়ে গেল। তার মুখের ওপর কত জোড়া চোখ অনড় হয়ে আছে ঠিক নেই। একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যাপার কিছু হতে যাচ্ছে আজ। এ সময়ে একটুও হাসলে সকলে ভাববে চন্দ্রা নারায়ণ পাগল হয়ে গেছে।...সেই একদিন হেসেছিল। জিত্‌ নারায়ণের বুকের ভিতরটা খুঁড়ে খুবলে খুবলে একাকার করে দেবার মতোই বেদম হেসে-

ছিল। তারপর তেমনিই কেঁদে উঠেছিল। কান্নাটা কোথা থেকে এসেছিল বা কেন এসেছিল জানে না। সেই হাসি আর সেই কান্না দেখে সকলে ধরে নিয়েছিল ওঝার ঘাড়েই ভূত চেপেছে। মনের ডাক্তার আর মন-ভোলানোর ডাক্তার চন্দ্রা নারায়ণের মাথা আর ঠিক নেই।

তাই আর হাসি নয়। আর কান্না নয়। কিন্তু ভিতরের ওই উল্টো-পাল্টা আবেগের ফলে চোখের সামনে এক একবার ঝাপসা দেখছে। অন্য জনের অন্য লোকের পাথর-চাপা আবেগের সুড়ঙ্গ পথে অনায়াসে ঢুকে যেতে পেরেছে। তাই নিয়ে কত ভেবেছে, কত মাথা ঘামিয়েছে। সেটাই তার কাজ। কিন্তু আজ বিচ্ছিন্নভাবে চন্দ্রা নারায়ণ নিজের আবেগটুকুই দেখতে পাচ্ছে না। সে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে বলেই থেকে থেকে ঝাপসা দেখছে চোখে।

…ছেলের দিকে চোখ। মুখখানা স্পষ্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে ন' বছরের ওই বাচ্চা, ও আর কিছু দেখছে না শুনছে না বুঝছে না। শুধু তার মাকেই দেখছে। এই মুহূর্তে ছেলেটার ভিতরের আবেগও অনুভব করছে চন্দ্রা নারায়ণ। সব বাধা নিষেধ ঠেলে কাছে এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু নড়ছে না। নড়তে পারছে না।

পাশে ওর বাবার অপলক দু'চোখও এই কাঠগড়ার দিকে। চন্দ্রা নারায়ণ এবার তাকে দেখছে। আরো—আরো ভালো করে দেখে নিতে চাইছে। তার বুকের তলায় আর কি কোনো অন্ধকার নেই? আক্রোশ নেই? সব সন্দেহ সব সংশয়ের কীটটা কি সত্যি কোনো আলোর ঘায়ে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে?

উঁচু আসনের বিচারক শেষ কি বললেন কানে ঢোকে নি। কিন্তু তাঁর ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বিচার ঘরের একটা রুদ্ধ নিশ্বাস যেন মুক্তি পেয়ে বাঁচল চারদিক থেকে অস্ফুট গুঞ্জন উঠল। বহু মুখের হাসির ছটায় এখানকার গুমোট আলোর রং পাল্টে গেল। অদূরের প্রহরীরা এগিয়ে এসে সসম্মানে ওর বেরিয়ে আসার পথ করে দিল।

বিচারের নিষ্পত্তি কোন্ দিকে গড়ালো এবারে চন্দ্রা নারায়ণ বুঝতে পারছে। তার দিকের নামজাদা উকিল জেল কাস্টডিতে এসে যতবার

দেখা করেছে, ওই এক নিষ্পত্তির আশ্বাসই দিয়ে গেছে।...জিত্‌ও সমস্ত আকূতি ঢেলে বারবার বলেছে কোনো ভয় নেই, কি-চ্ছু ভয় নেই। ওরা কেউ জানে না, চন্দ্রার মনের তলায় ভয়ের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। কোনো কিছু অনুভব করার শক্তিই ছিল না। যে যা বলেছে, নির্বাক চেয়ে চেয়ে শুনেছে। তারপর ভুলে গেছে। একটানা অনেকগুলো দিন চন্দ্রা এক বিস্মৃতির জগতে ঢুকে পড়েছিল। সেই ঘোর এখনো ভালো করে কেটেছে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

...এরা কেউ তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয় নি। বিচারক চন্দ্রা নারায়ণকে নিরপরাধ বলে গেলেন। সসম্মানে মুক্তি দিলেন। আইনের চোখে আত্ম-রক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। নিজের শ্লীলতা আর ইজ্জত রক্ষার অধিকার সব মেয়েরই আছে।

কলের পুতুলের মতোই চন্দ্রা নারায়ণ বেরিয়ে এলো। আশ-পাশে অনেক লোকের ভিড়। তাদের প্রসন্ন মুখ। ওকেই দেখছে। সামনে ছেলে। স্বামী। ছেলে ছুটে এসে দু' হাতে মাকে জাপটে ধরল। হ'সতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আর আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। এ জীবনে আর যেন ছাড়বেই না মাকে।

চন্দ্রা নারায়ণ আস্তে আস্তে দু' পায়ের ওপর বসল। আঁচলে করে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল। তারপর দু' হাতে মুখখানা ধরে ভালো করে দেখতে লাগল। দুজনেরই মুখের ওপর খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার-দের ফ্ল্যাশ বাল্‌বের মুহুর্মুহু ঘা পড়তে লাগল।

উঠল। সামনে স্বামী। জিত্‌ নারায়ণ। সে ওকে দেখছে। চন্দ্রা তাকে দেখছে। থেকে থেকে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ঝল্‌সে উঠছে। চন্দ্রা নারায়ণের দু' চোখ তার মুখের ওপর স্থির। শুধু তাকেই দেখছে। তার রোগ একেবারে ছেড়ে গেল কিনা দেখছে। তার বুকের তলার সেই অন্ধকার, হিংসার সেই বিষ বাষ্প, অবিশ্বাসের সেই কীটের আর অস্তিত্ব আছে কিনা দেখছে। দেখা গেল না। অস্তিত্ব নেই। থাকলেও চন্দ্রার চোখে পড়ত।

জিত্‌ এগিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত ধরল। আনন্দে আশায় উত্তেজনায় তার হাত ঘামছে। কাঁপছে। বলল, এসো—

পায়ে পায়ে এগলো। চন্দ্রার অন্য হাত ছেলের শক্ত হাতে।...কিন্তু কোথায় চলেছে চন্দ্রা নারায়ণ ? অন্ধকারের পাতাল থেকে অমৃতের আলোয় ? নিঃসীম মৃত্যু থেকে জীবনের উষ্ণ তাপে ? তাই। তাই যেন। কিন্তু তবু চন্দ্রা নারায়ণের বুকের ভিতরটা ভরে উঠছে না কেন ? এই মুহূর্তটাই সব থেকে সত্যি ধরে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক হতে পারছে না কেন ? পিছনে যা পড়ে থাকল সেটা একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে মন থেকে ছেঁটে ফেলে দিতে পারছে না কেন ?

সামনেএকটা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। তেজী ঘোড়াটা থেকে থেকে পাথরে বাঁধানো রাস্তায় পা ঠুকছে। জিত্ তার হাত ধরে সেদিকে এগোতে চন্দ্রা দাঁড়িয়ে গেল। আবার চোখ তুলে মানুষটার দিকে তাকালো।

জিত্ ভাবল টাঙ্গা কেন বা কোথায় যাওয়া হবে এই জিজ্ঞাসা। ব্যস্ত মুখে জানান দিল, তোমাকে বলেছি না। এখানকার কোর্টে কেস শুরু হবার আগে থেকেই এখানে এসে বাচ্চুকে নিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছি— ভুলে গেছ ? চল—

চন্দ্রা তবু দাঁড়িয়ে রইল, তবু চেয়েই রইল দেখে আবার কিছু মনে পড়ল জিতের।—ও, টাঙ্গা কেন ভাবছ ? ক'দিন যাবৎ ওটাই ভাড়া করে রেখেছি...কি করব, তোমার আদরের বেবি অস্টিন তো মহানগরের কোয়ার্টারস্-এই পড়ে আছে—তার একমাত্র ড্রাইভার তো তুমি, আনব কি করে ? হাসল। ব্যগ্র মুখে বলল, কিন্তু আর সেটি হচ্ছে না—তোমার ড্রাইভার বলো গাড়োয়ান বলো এবার থেকে সব আমি। বুঝলে ?

চন্দ্রা দেখছে। শুনছে। লোকটার মুখের ওপর মুখোশ নেই। কথাগুলোও মেকি নয়।

পাঁচ হাতের মধ্যে ঘ্যাচ করে একটা বড় সড় মোটর গাড়ি এসে থামতে সকলের দৃষ্টি সেদিকে। চেনা গাড়ির দরজা খুলে একরাশ রজনীগন্ধার গোছা হাতে হন্তদন্ত হয়ে যিনি নামলেন, তাঁকে দেখা মাত্র চন্দ্রার চোখের কোণ দুটো শিরশির করে উঠল। প্রোফেসার মহেশ্বর যাদব। ঝাঁকড়া এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। আধবয়সী কালো মুখের হাসি বেশি সুন্দর কি তাঁর হাতের ওই দুধ-সাদা মস্ত ফুলের গোছা ?

—হ্যালো হ্যালো হ্যালো চন্দ্রা। আই অ্যাম লেইট! তিন-তিনটে রোগীকে জাহান্নমে পাঠিয়ে মহানগর থেকে সত্তর কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি হাঁকিয়েও দেরি! হ্যালো মিস্টার জিত্‌ নারায়ণ—নাও অল গ্রান অন্‌ দি হোমওয়ে ফ্রন্ট? কংগ্র্যাচুলেশন্‌স কংগ্র্যাচুলেশন্‌স!

এই মস্ত ফুলের গোছা চন্দ্রার দু'হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাত আর ফুলসুদ্ধ দুটো খুশির ঝাঁকুনি। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড! ইউ আর সাচ এ ব্রেভ ইয়ং লেডি! আমি তো জানতাম কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হতে পারে না—গড্‌ ক্যান্‌ নেভার বি দ্যাট্‌ ক্রুয়েল!

চন্দ্রার চোখের কোণ দুটো এখন আরও বেশি শিরশির করছে। কিন্তু চন্দ্রা নারায়ণ তুমি কাঁদবে না, তুমি কাঁদতে পারো না—তুমি কাঁদতে জানো না—সেই একবার সকলের বুক কাঁপিয়ে হেসেছিল যে সে তুমি নও, আর তারপর সেই একজনকে দেখে সকলের বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে সেই একবার সে কেঁদেছিল—সেও তুমি নও! চন্দ্রা নারায়ণ আজ তুমি কাঁদবে না, কক্ষনো কাঁদবে না!

ফুলের বোঝা বুকে নিয়ে চন্দ্রা ঝুঁকে নিচু হয়ে তাঁর জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল। আনন্দে মহেশ্বর যাদব দু-তিনবার পিঠ চাপড়ে দিলেন।—মাই ডিয়ার···ডিয়ার···ইউ হ্যাভ সাফার্ড অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ ওয়ান্‌। নাও ইউ ডিজার্ভ এ জলি গুড রেস্ট—

চন্দ্রা সোজা হয়ে দাঁড়াতে এগিয়ে এসে জিত্‌ও তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। চন্দ্রা দেখেছে। এই প্রথম প্রণাম। সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠেও দুটো বড় চাপড় বসালেন প্রৌঢ় মহেশ্বর যাদব। তরল গলায় বলে উঠলেন, তুমি প্রণাম করো আর যা-ই করো, ইউ আর এ রাসকেল, আর আমি তোমাকে এখনও হিংসে করি। সাম ডে আই উইল স্ন্যাচ দ্যাট প্রেটি বার্ড ফ্রম ইউ।

হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। চন্দ্রার দু'চোখ এবার আপনা থেকেই সজাগ তীক্ষ্ণ একটু। সে তার ঘরের লোককে দেখেছে। এ রকম দিলখোলা রসের কথা এই লোক আগেও শুনেছে। আধবয়সী এই হৃদয়সর্বস্ব মানুষটিকে নিয়েও তার সেই সংশয় আর সন্দেহের কীট কিলবিল করে উঠে হিংস্র

কামড় বসাতে চেয়েছে, সে শুধু চন্দ্রা জানে।

কিন্তু না। এই প্রণাম প্রণামই। জিত্‌ হাসছে।

ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ কানে আসতে সামনে তাকালেন প্রোফেসার যাদব। বললেন, টাঙ্গা কেন, চলো, আমার গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, লেট আস হ্যাভ এ হ্যাপি রাইড টোগেদার।

একটিও কথা না বলে চন্দ্রা এবার জিতের দিকে তাকালো, সে ওর দিকে। কিন্তু স্ত্রীর এবারের তাকানোটা অন্য রকম লাগছে হয় তো। এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলে নি। এবারে কিছু জানতে চায় মনে হলো, কিছু বলবে মনে হলো।

—জোসেফ মদন বিশ্বাসকে কোথায় রাখা হয়েছে?

চন্দ্রা নারায়ণ জোরে বলে নি কথাগুলো। কিন্তু একটি একটি করে স্পষ্ট করে বলেছে। তাইতেই পরিষ্কার আকাশ থেকে জিতের মুখের ওপর একটা বাজ খসে পড়ল বুঝি। মহেশ্বর যাদবও সচকিত। ছেলেটাও ফ্যালফ্যাল করে মায়ের দিকেই চেয়ে আছে।

নিজেকে একটা অজানা বিপাকের থেকে টেনে তোলার চেষ্টা জিতের। মুখের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা এ-সময়ে এই জিজ্ঞাসা কেন। কিন্তু স্ত্রীর মুখ আবার আগের মতো ভাবলেশশূন্য। অপলক দুটো চোখ তার মুখের ওপর।

বিড়বিড় করে জিত্‌ জবাব দিল, ওদের সেই ফুলবাগে।...কেন?

আস্তে আস্তে চন্দ্রা এবার প্রোফেসার যাদবের দিকে ফিরল। এই মানুষটির চোখেও একই প্রশ্ন।

চন্দ্রার স্থির ঠাণ্ডা দু'চোখ প্রোফেসারের মুখের ওপর।—আপনি আপনার গাড়িতে এদের পৌঁছে দিন স্যার...আমার ফিরতে একটু দেরি হবে।

টাঙ্গার দিকে পা বাড়াতে হতভম্ব জিত্‌ কি করবে ভেবে না পেয়ে তাকে বাধা দেবার জন্যেই হাত বাড়ালো। চন্দ্রা ঘুরে আবার সোজা তাকালো তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জিতের চাউনিটা বড় রকমের হোঁচট খেল একটা। চোখ ফিরিয়ে নিল। মুখে অসহায় পরিতাপের ছায়া।

ছেলের দিকে ফিরল চন্দ্রা। তার মুখেও ভয় বিস্ময় আকূতি। আশ্বাসের

সুরে চন্দ্রা বলল, বাড়ি যা, আমি শিগগীরই ফিরব…।

প্রোফেসার যাদব এগিয়ে এলেন। অবাক তিনিও।—এই টাঙ্গায় করে তুমি এখন ফুলবাগে যাবে! সে তো মহানগর থেকেও দু-আড়াই মাইল দূরে!

চন্দ্রা জবাব দিল না। নির্বাক দু' চোখ তাঁর মুখের ওপর। এটুকু থেকেই যা বোঝার বুঝে নিলেন ভদ্রলোক। বললন, ঠিক আছে, যাবেই যদি আমার সঙ্গে চলো পৌঁছে দিচ্ছি—এরা টাঙ্গায় চলে যাক।

এই মানুষটি জোরালো আপত্তি তুললে চন্দ্রার অসুবিধে। বলল, আপনার কখনো অবাধ্য হইনি স্যার, আজকের দিনটা আমাকে মাপ করুন।

প্রোফেসার যাদব সেই মানুষ যিনি দেখতে চাইলে লোকের ভিতরসুদ্ধ দেখতে পান। এই ভেতর দেখাটাই তাঁর পেশা। দেখলেন কিছু। আশ্বাসের সুরে বললেন, অল্ রাইট, অল রাইট! ঘুরে দাঁড়ালেন। জিত্ আর বাচ্চ কে ডাকলেন, কাম অন্ বয়েজ্—

ধীর শান্ত পায়ে চন্দ্রা টাঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। হাতের ফুলের গোছা সামনের সিটে রেখে নিজেও উঠল। আর কোনো দিকে তাকালো না। কারণ সে জানে ওই বাপ ছেলে সভয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ওকেই দেখছে।

বাঁধানো রাস্তা ধরে টাঙ্গা ছুটেছে। কখনো ঢালুতে নামছে, কখনো ওপরের দিকে উঠছে। ডাইনে জঙ্গল বাঁয়ে পাহাড়, নয়তো বাঁয়ে জঙ্গল ডাইনে পাহাড়। রাস্তাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে কখনো বা কুণ্ডলি পাকিয়ে সামনে এগিয়েছে। ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশ। পাহাড় আর জঙ্গলের মাথায় ঝলমলে রোদ।

আকাশ পাহাড় বা জঙ্গল কিছুই দেখছে না চন্দ্রা নারায়ণ। শুধু চলেছে। কানের কাছে, না কানের কাছে নয়, মাথার মধ্যেই রিনরিন রিনরিন একটা টানা শব্দ বেজে উঠতেই সে সজাগ একটু। মুখে অস্বস্তির ছায়া। ওই শব্দটা ঠেলে সরানোর চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গেলে ওটা আরো বাড়ে জানে। বাড়ছেও। ওটার সঙ্গে অবধারিত কোনো অশুভ

স্মৃতির যোগ···।এই দিনেও এমন অনেক কিছু ঘটে, বিজ্ঞানের জোরালো আলো ফেলেও যার কোনো ব্যাখ্যার হদিস মেলে না। ওই টানা রিন-রিন-ঠ্নঠ্ন-রিনরিন শব্দটাও সেই গোছের এক দুর্বোধ্য ব্যাপার চন্দ্রার এক মাসতুতো ভাই ছিল নাম শত্রুঘ্ন, সমবয়সী। চন্দ্রা মাস দুই-তিনের বড় হতে পারে। শত্রুঘ্নরা অনেকগুলো ভাই বোন। বাপের দিন-আনা দিন-খাওয়া অবস্থা। তার ওপর এই ছেলেটা একেবারে ছেলে-বেলা থেকেই বেজায় দুরন্ত। তিক্ত বিরক্ত হয়ে ওর মা এই ছেলেকে এনে বোনের হাতে অর্থাৎ চন্দ্রার মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে গেছল। বলেছিল, ও শত্রুঘ্ন নয়, শত্রু। এই শত্রু আমার হাড় কালি করে দিল। তুই না রাখলে ও আমার হাতেই মরবে একদিন।

মা রেখেছিল। শত্রুঘ্নের বয়েস তখন সবে দশ বেশ মিষ্টি চেহারা। মিষ্টি মিষ্টি হাসে। কিন্তু ভেতরে এমন একটা বজ্জাত ছেলে চন্দ্রা আর বুঝি দেখেনি। সব থেকে বেশি চন্দ্রার পিছনেই লাগত। কত সময় কত বিপাকে ফেলেছে ওকে ঠিক নেই। চন্দ্রা ওর চুলের ঝুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে এক-এক সময়। কত এলোপাথাড়ি কিল-চড় মেরেছে। স্কুলে রওনা হবার মুহূর্তে বই খাতা পেন্সিল রাবার যা-হোক কিছু একটা চোখের পলকে কখন যে সরিয়ে ফেলত, চন্দ্রা টেরও পেত না। যার ফলে স্কুলে গিয়ে হামেশাই চন্দ্রাকে শাস্তি পেতে হতো। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরে দেখত শয়তান ছেলে ঠিক জায়গা মতো আবার তার জিনিস রেখে দিয়েছে। মা-বাবা গোড়ায় অনেক দিন বিশ্বাসই করতে চায় নি, ভেবেছে মেয়েই ভুল করে ফেলে গেছে। পরে ওই পাজি ধরাও পড়েছে আর ওরই হাতে কিল-চড় খেয়েছে।

সমবয়সী, কিন্তু পড়ত চন্দ্রার থেকে দু'ক্লাস নিচে। তাই চন্দ্রা ওর ওপর মাস্টারি করারও সুযোগ পেত। ও তো ক্লাসের বরাবর প্রথম হওয়া মেয়ে। কান ধরে টেনে নিয়ে ওকে পড়াতে বসত। মাস্টার যখন, কড়া মাস্টার। পড়া না পারলে বা অমনোযোগী হলেই মাথায় গাঁট্টা। ও যত মারত, শত্রু ততো বলত, তোর হাতের গাঁট্টা বড় মিষ্টি—অত জোরে মারিস না, নিজেই ব্যথা পাবি।

চন্দ্রা কোনদিন ওকে শত্রুঘ্ন বলেনি। বরাবর শত্রু বলে ডেকেছে।…শত্রুই তো। এমন শত্রু আর আছে!

…একদিন পর পর ছ'টা গাঁট্টা খাবার ফলে শত্রুর মাথায় শয়তানি কিলবিল করে উঠল। ছোট টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসেছিল দু'জনে। ছ'নম্বর গাঁট্টা মাথায় পড়তেই হাসি-হাসি মুখে ও উঠে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে নিজের কপালটা ওর কপালে এত জোরে ঠুকে দিল যে চন্দ্রা নিজের চেয়ারসুদ্ধ উল্টে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল। শত্রুঘ্ন ততক্ষণে বাড়ি থেকেই হাওয়া।

মেয়ের চিৎকার আর পড়ার শব্দ শুনে বাবা মা লীলামাসি সকলে ছুটে এসেছে। মেয়ের মুখ নীল বর্ণ। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। কপালের মাঝ-খানটা আলুর মতো ফুলে উঠেছে। কি করে কি হলো শোনার পর বাবা ক্ষেপেই গেছল। মা-কে বলেছিল, আজই যেন ওই ছেলেকে তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ের হেনস্থা দেখে মায়েরও কম রাগ হয়নি। বাবার কথায় সায় দিয়েছে। ওকে আর রাখবে না।

কিন্তু বিকেল পর্যন্ত ছেলে নিপাত্তা। ফলে বাবা মা আরো ক্রুদ্ধ। এ-দিকে তখন পর্যন্ত চন্দ্রার কপালের ব্যথা সারে নি। তবু আসল বিপাকে যেন ও-ই পড়েছে। শত্রুকে তাড়িয়ে দিলে ও একলা বাড়িতে আর টিকবে কি করে? এই একটা বছর ওর সঙ্গে আড়াআড়ি মারামারি করেও চমৎকার কেটে গেছে। তাছাড়া নিজের অজান্তে ও যে কতখানি আপনার হয়ে গেছে তা কি জানত? আজ চন্দ্রার স্কুলে যাওয়া হয় নি। ও-ছেলেও না খেয়ে না দেয়ে খালি হাতে স্কুলে গেছে এ হতেই পারে না। সমস্ত দিন পাজীটা মুখ শুকিয়ে আছে মনে হতেই মন খারাপ হতে শুরু করেছে চন্দ্রার। এদিকে বাবা মায়েরও মেজাজ চড়ছেই। পরের ছেলে নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। একবার হাতে পেলে আর না। বাবা তাকে সোজা তার বাপ-মায়ের কাছে চালান করে দেবে এ হুমকি চন্দ্রা বারবার শুনছে। কিন্তু খোঁজা-খুঁজি করেও তার টিকির দেখা পাচ্ছে না।

বিকেলে চন্দ্রা সামনের পার্কে খেলতে যায়। মাথা খাটিয়ে একটা মতলব ঠিক করল। মায়ের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে খেলতে চলল।

তখনো বাড়ির চাকর আর ড্রাইভারের খোঁজাখুঁজি চলছে। চন্দ্রা মনে মনে প্রার্থনা করল, ওরা যেন শক্রকে ধরতে না পারে। আর ও যেন পারে। চন্দ্রার বদ্ধ বিশ্বাস, হয় লেকের পারে মাছ ধরার ঘেরা জায়গায় নয়তো নর্মদার ধারে কোথাও ওই পাজীকে ঠিক পাবে। এই দুটো জায়গার ওপরেই ওর খুব টান। বাড়িতে কি-চ্ছু না জানিয়েচন্দ্রা কতদিন শক্রর সঙ্গে নর্মদার ধারে এসে দু'জনে ছোটাছুটি করেছে। আর লেকে এসে মাছ-ধরাও দেখেছে। কিন্তু মাছ-ধরাটরা দেখতেচন্দ্রার অত ভালো লাগত না। ধৈর্য থাকত না। বড়সড় মাছ বঁড়শীতে আটকালে দেখতে অবশ্য খুব মজা। কিন্তু কখন আটকাবে তার জন্য মুখ বুজে বসে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। শক্রু এ ব্যাপারে ঠিক উল্টো। এ-বেলায় তার ধৈর্যের শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে পারে।

ভেবে নিয়ে চন্দ্রা আগে লেকের দিকেই চলল। সকাল থেকে এত সময় কাটানোর সমস্যা আছে যখন, শক্রুকে ওখানেই পাওয়া সম্ভব।

যা ভেবেছে তাই। পনের হাত ফারাকে দু'জন আধবয়সী মানুষ ছিপ ফেলে জপের মুখ করে বসে আছে। তাদেরই একজনের গা ঘেঁষে বসে ওই পাজীও তন্ময়। ওর হাতে একটা ছোট ঠোঙা। চিবুচ্ছে কি। মুড়ি বা বাদাম-টাদাম হবে।

পা টিপে চন্দ্রা পিছন দিক দিয়ে এগিয়ে এলো। ওকে দেখে যদি ছুট লাগায়, চন্দ্রার সাধ্য নেই ধরে। চারায় মাছ এসেছে বোধহয়। শক্রু ঝুঁকে আরো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। চন্দ্রা ওর পিছনে এসে দু'হাতে আচমকা ওর চুলের মুঠি ধবে এক হ্যাঁচকা টানে মাটিতে শুইয়ে ফেলল। এবারে চন্দ্রারই দু'ঘা দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মাছধরা লোকটা এমন বিরক্ত চোখে ফিরে তাকালো যে থমকে যেতে হলো। তারপর মাটি থেকে ওকে টেনে তুলল। এক হাতে জামার কাঁধ আর অন্য হাতে সামনেটা শক্ত মুঠোয় ধরে খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে এলো। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে।

—ছাড়্।

—ছাড়ব তোকে? চন্দ্রা ফোঁস করে উঠল।—ফের পালানোর মতলব আমি বুঝি না—তোকে ছাড়ব?

শক্রুর চোখে মজার ছোঁয়া।—তুই ক্লাসে ফার্স্ট হলে কি হবে, মাথায় কিছু নেই। আমি পালাতে চাইলে তুই আমাকে ধরে রাখতে পারবি?

পারবে না চন্দ্রা সেটা ভালোই জানে। তাই আপসের চেষ্টা। একটা হাত ছেড়ে ফ্রকের পকেট থেকে টাকাটা বার করে দেখালো। বলল, তোর জন্য মায়ের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি, সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নি তো?

শক্রুঘ্ন বলল, কই আর হলো, পেট চুঁইচুঁই করতে এক বন্ধুর কাছ থেকে দশটা পয়সা ধার করে চারটি মুড়ি কিনে খাচ্ছিলাম—পিছন থেকে এসে ও-ভাবে টান মেরে তারও আর্ধেক তুই ফেলে দিলি।

উদার হয়ে আস্ত টাকাটাই চন্দ্রা ওর হাতে দিয়ে দিল।—তোর যা-খুশি কিনে খেয়ে নে আগে, তারপর বাড়ি চল্—।

টাকাটা নিতে গিয়ে এবারে ওর কপালের দিকে চোখ পড়ল শক্রুর।—ইস্, তোর কপালটা যে এখনো ফুলে আছে রে…! এত জোরে লেগে যাবে ভাবি নি। ঝুঁকে মাটি থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে বাড়ালো।—আচ্ছা, এটা দিয়ে যত জোরে খুশি তুই আমার কপালে মার।

ওর হাত থেকে পাথরটা নিয়ে চন্দ্রা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখ মুচকে বলল, আমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, বাড়ি গেলে বাবা মা-ই হাত গুঁড়িয়ে দেবে—তারপর তোকে তোদের বাড়িতে পার করে দিয়ে আসবে

তাচ্ছিল্যে ঠোঁট উল্টে শক্রু বলল, আমার যেতে বয়ে গেছে কোথাও, নর্মদার পাড় ধরে সোজা হাঁটা দেব এক্ষুনি, তারপর যা হয় হবে—

চন্দ্রা খপ করে আবার ওর জামা মুঠো করে চেপে ধরল।—খবরদার, ভালো হবে না বলছি!

—তুই তো বললি বাড়ি গেলে মেসোমাসি হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, তাহলে যাব কেন?

চন্দ্রা তবু রেগেই গেল। --আমাকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি?

শক্রু অম্লানবদনে জবাব দিল, খু-ব।

—তাহলে মর গে যা—যেখানে খুশি চলে যা! জামা ছেড়ে দিয়ে দুমদাম পা ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর সত্যি চলে যায় কিনা দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। শত্রু পায়ে পায়ে ওর কাছে এগিয়ে এলো আবার। বলল, না রে, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, তুই বাড়ি গিয়ে মেসো-মাসিকে বল্, আমাকে যত খুশি মারুক কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া চলবে না।

তক্ষুনি আবার ভাব। এক টাকার কচুরি সিঙাড়া খেতে খেতে দু'জনে মিলে বিপদ এড়ানোর উপায় বার করতে চেষ্টা করল। উপায় একটা চন্দ্রার মাথাতেই এসে গেল। বলল, ঠিক আছে চল্—তোকে মারের হাত থেকেও বাঁচাতে পারি কিনা দেখি। কিন্তু খবরদার, আর পালাবার কথা মাথায়ও আনবি না!

যে দিদিমণিটি সন্ধ্যায় বাড়িতে চন্দ্রাকে পড়ায় দু'জনে তার ওখানে হাজির। ওই দিদিমণি চন্দ্রাকে দারুণ ভালবাসে। তার ওখান থেকে নিজেদের বাড়িও কাছেই। দিদিমণিকে জানান দিল, আজ সে পড়বে না কারণ শরীরটা ভালো নেই।···শত্রুটা বাবার মারের ভয়ে সকাল থেকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আছে, খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। দিদিমণির কাছে ও এখন থাকল। ও বাবা-মায়ের সঙ্গে একটু বোঝা-পড়া করে এক্ষুনি আসছে।

ছুটে চলে গেল। নিজেদের বাড়ি যখন পৌঁছলো, দস্তুর মতো হাপাচ্ছে। বাবা-মা-কে একসঙ্গেই পেল। উত্তেজনায় নিজেই কাঁপছে। বলল, শত্রুকে পেয়েছি! তোমরা যদি ওকে না মারো আর ওর বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে না দাও তাহলে আসবে। তা না হলে নর্মদার তীর ধরে হেঁটে হেঁটে যেখানে হোক চলে যাবে—

চাপা গর্জনে বাবা জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে?

—আমার কথায় বিশ্বাস করে ও এক জায়গায় অপেক্ষা করছে, আগে কথা দাও তোমরা ওকে কিছু বলবে না—

—চন্দ্রা! বাবা আরো রেগে গিয়ে ধমকে উঠলো। তারপর মা-কে বলল, ব্রিজমোহনকে ওর সঙ্গে পাঠাও - ধরে নিয়ে আসুক।

ব্রিজমোহন পুরনো ড্রাইভার। বয়েস হলেও জোয়ান মানুষ। কিন্তু বাপের

আদুরে মেয়েরও রাগ হলে তেমনিই মেজাজ। চিৎকার করে উঠল, ব্রিজ-মোহনকে নিয়ে যাব না—কাউকে বলব না—শক্রকে বলব যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যেতে! কেন ওকে মারবে তোমরা? কেন তাড়িয়ে দিতে বলবে? দোষ তো আমার—আমি ছ' ছ' বার কষে ওকে গাঁট্টা মারতে ও ওই রকম করে ফেলেছে। এখনো আমার কপাল ফুলে আছে দেখে ওর কত কষ্ট হয়েছে জানো তোমরা —জানো?

বাবা মা মেয়ের এই মূর্তি দেখে আর এই কথা শুনে হকচকিয়ে গেল। তারপর চোখে চোখে দু'জনের কি কথা হলো। বাবা চেষ্টা করে গম্ভীর এবার।—আচ্ছা যা, ডেকে নিয়ে আয়

চন্দ্রার তবু অবিশ্বাস।—মারবে না ওকে?

—না।

—এখান থেকে তাড়াবে না?

—দোষ যখন তোর, তাড়াব কেন?

চন্দ্রা উর্ধ্বশ্বাসে দিদিমণির বাড়ি ছুটল আবার। বাবু সেখানে গ্যাঁট হয়ে বসে এক থালা লুচি সাবড়াচ্ছে।

এমনি করেই কতগুলো বছর কেটেছে। চন্দ্রার তখনো হাত আর শাসন দুই-ই চলে। তলিয়ে দেখলে দোষ শক্রুরই। কারণ সে খুনসুটি করতে ছাড়ে না। ফাঁক পেলে আগের মতোই ওকে বিপাকে ফেলে। চন্দ্রা নাগালের মধ্যে পেলে চড়-চাপড় বসিয়ে দেয়, চুলের ঝুঁটি ধরে শুইয়ে ফেলে। কিন্তু ওর ওপর আর কারো শাসন বরদাস্ত করে না। আর এক বেলা চোখের আড়াল হলে ছটফটানি শুরু হয়। স্কুল ছেড়ে চন্দ্রা যখন কলেজে পড়ে, তখনো বন্ধুরা ওই মাসতুতো ভাইকে নিয়ে বিচ্ছিরি হাসি ঠাট্টা করত। বলত, কি-রকম মাসতুতো ভাই-বোন রে তোরা—চোরে চোরে নয়তো?

শক্রু কোনোরকমে স্কুলের বেড়া টপকালো চন্দ্রার দু'বছর পরে। চন্দ্রা তখন আই. এস.সি. পাশ করে ডাক্তারি পড়ার তোড়জোড় করছে। বাবা এখানকার মস্ত এক মেডিক্যাল ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার। তাঁর প্রথম থেকে ইচ্ছে মেয়ে ডাক্তার হোক। আর মেয়েও সেই মতোই প্রস্তুত

হয়েছে।

কিন্তু শত্রুকে আর কলেজে ঢোকানোই গেল না।তার সাফ কথা. একটা বেড়া টপকেছে ঢের হয়েছে—আবার ও রাস্তায়!

রাস্তা একটা নিজেই ঠিক করে নিল। ওর এক বন্ধুর দাদা ফায়ার সার-ভিসের পদস্থ অফিসার। তাকে ধরে ফায়ার ব্রিগেডের অ্যাপ্রেনটিস হয়ে বসল। হাতে কলমে শেখার পর চাকরিও হলো। এই কাজে লেগে থেকে ফুর্তিবাজ ছেলে একটা ভালো বিদ্যে রপ্ত করল। এক আঙুলে নিজের নাকে টোকা দিয়ে দিয়ে মুখে এমন দমকলের ঘন্টির আওয়াজ তুলতে পারত যে সামনাসামনি না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না ওটা সত্যিকারের দমকলের ঘন্টি নয়। শুধু তাই নয়, অনেক দূর থেকে দমকলের ঘন্টির যেমন ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ ভেসে আসে আর ক্রমশ জোরালো হতে থাকে, তারপর কানে তালা লাগিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে দূরে সরতে থাকে—গলা দিয়ে আর নাকে টোকা মেরে এই ছেলেও হুবহু তাই করতে পারে। বেশ দূরে চলে গেলে আবার সেই ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দের রেশ। আচমকা এই শব্দ বার করে কতদিন যে চন্দ্রাকে ঠকিয়েছে তার ঠিক নেই। শুধু চন্দ্রা কেন, খেয়াল না করে যে শুনেছে সেই ঠকেছে। এ এক মজার খেলা শত্রুর।

সেদিন ওর নাইট ডিউটি ছিল। এই চাকরিতে নাইট ডিউটি হামেশাই থাকে। সময় মতো খেয়ে দেয়ে চলে গেছে। চন্দ্রাও তার পড়াশুনা সেরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। ডাক্তারি পড়ার শুরু থেকেই দস্তুর মতো সীরি-য়াস! সকালে রাতে নিয়ম করে পড়ে।

রাত কত তখন জানে না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যেতে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল।…শব্দটা স্পষ্ট শুনেছে। উঠে বসার পরেও যেন কানে লেগে আছে। বেশ দূরের দমকলের ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ। চন্দ্রা স্পষ্ট শুনেছে। অন্ধকার ঘরে বিছানায় বসেই কান পাতল। আর শুনছে না। বেড ল্যাম্পটা জ্বেলে সময় দেখল। রাত তিনটে। একবার ভাবল, নাইট ডিউটি ফাঁকি দিয়ে শত্রু বাড়ি চলে এসেছে আর তারপর দুষ্টুমি করে ওকে জাগাবার জন্য গলা দিয়ে ওই শব্দ বার করেছে। তারপর ভাবল দূরের

দমকলের শব্দই হবে। বাবার ঘুম ভাঙার ভয়েও এত রাতে ও এই মজা করতে যাবে না।

আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতেও সময় লাগল না। তবে ঘুমটা তখনো জোরালো হয়ে ওঠে নি। আবারও চমকে জেগে গেল। আবারও সেই ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ। শব্দটা তেমনি চাপা বটে কিন্তু এবারে আরো স্পষ্ট। শুয়ে শুয়েই চন্দ্রা কান পাতল। হ্যাঁ, ওদিক থেকে একটা শব্দ এখনো আসছে বটে। তারপর খেয়াল হলো, টেলিফোন বাজছে। আবার আলো জ্বেলে চন্দ্রা উঠে বসল। ঘড়িতে চারটে। এ-সময় কার টেলিফোন ভেবে পেল না।

সামনের ঢাকা বারান্দায় টেলিফোন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে দেখে ঘুম চোখে বাবা রিসিভার তুলেছে। সাড়া দেবার একটু পরেই বাবাকে আতকে উঠতে দেখল চন্দ্রা। আর তার পরেই বোঝা গেল বড় রকমের অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

রিসিভার নামিয়ে বাবা বলল, শিগগীর তৈরি হয়ে নে, এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে—ছেলেটার কিছু হয়েই গেল বোধহয়।

বাবা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে গেল। কে ছেলেটা বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল না চন্দ্রার। কয়েক মুহূর্তের জন্য কাঠ একেবারে। ঘুমের মধ্যে দু' দু'বার দূরের দমকলের সেই চাপা ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ শুনেছে, দু'বারই মনে হয়েছে দূর থেকে ওটা দূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু অমন মৃদু শব্দ ঘুমের মধ্যে এত স্পষ্ট হয়ে কানে বেজেছিল কি করে জানে না।

...হাসপাতালে এসে শত্রুকে আর জীবিত দেখতে পায় নি। সেই দগ্ধ বীভৎস মূর্তি দেখে চন্দ্রার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। এক মস্ত কাঠের গুদামের আগুন নেভাতে গিয়ে এই অ্যাকসিডেণ্ট। না, ঠিক আগুন নেভাতে গিয়ে নয়, আগুন থেকে এক আধ-বুড়ো দরোয়ানকে বাঁচাতে গিয়ে। কেউ বাঁচে নি। জ্বলন্ত ছাদ ভেঙে পড়তে দু'জনেই শেষ।

...অ্যাকসিডেণ্টটা হয়েছে রাত দেড়টায়।...চন্দ্রা সেই দূরের দমকলের ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ একবার শুনেছে রাত তিনটেয়, একবার রাত চার-টেয়। অ্যাকসিডেণ্ট যেখানে, ওদের বাড়ি থেকে সে-জায়গা পাঁচ ছ'মাইল

দূরে। একসঙ্গে পাঁচটা দমকল শব্দের ঝড় তুলে গেলেও সেটা চন্দ্রার শুনতে পাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

...শত্রু শত্রুই বটে। এই শত্রুকে জীবনে না দেখা বরং ভালো ছিল।

এর পর থেকেই এক অদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎ হঠাৎ ওই ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দটা কানে বাজে। চন্দ্রা তখন ভয়ংকর চমকে ওঠে। কারণ, ওই শব্দটার সঙ্গে কোনো অশুভ ঘটনার যেন অবধারিত যোগ। এমন বার কয়েক শুনেছে। আর তারপরেই অশুভ কিছু না কিছু ঘটেছে। ...বাবা একবার গাড়িতে টুরে বেরিয়েছিল। কাছাকাছি হলে গাড়িতেই গিয়ে থাকে। বুড়ো পুরনো ড্রাইভার ব্রীজমোহন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে। পাকা ড্রাইভার। চন্দ্রাও ওর কাছেই ড্রাইভিং শিখেছে। খোকীদিদিকে ভারী ভালবাসত ব্রীজমোহন। ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স পেয়ে খোকীদিদি ওকে একটা দামী রিস্ট ওয়াচ কিনে দিয়েছে সেটা বোধহয় ওর চেনা-জানা কারো জানতে বাকি ছিল না।

...সন্ধ্যার মুখে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সবে নিজের ঘরে বসেছিল। হঠাৎ কানে সেই ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ। যেন অনেক দূর দিয়ে একটা দমকল চলে যাচ্ছে। এই শব্দটার সঙ্গে স্মৃতির যোগ ছিল বলেই চন্দ্রা চমকে উঠেছিল, নইলে কোনো অঘটনের ছায়া তখনো মনে আসে নি। ভ'র সন্ধ্যেয় ওই অস্পষ্ট শব্দ কানে এসেছে যখন, ধরেই নিয়েছিল অনেক দূর দিয়ে কোনো দমকল চলে গেল।

পরদিন বিকেলে অন্য অপরিচিত এক ড্রাইভারকে বাবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসতে দেখে চন্দ্রা বিমূঢ়। বাবার একটা হাত ব্যাণ্ডেজে মোড়া, গাড়ি থেকে নেমে খুঁড়িয়ে বাড়ি ঢুকছে।

...ঘটনা শুনল। জঙ্গলের পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা ধরে সন্ধ্যার একটু আগে জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ব্রীজমোহন। হঠাৎ তার কি হলো বাবা বুঝতেও পারল না। সেই বেগের মাথায়ই আচমকা ব্রেক কষল ব্রীজমোহন। গাড়িটা থামতে থামতেও রাস্তার পাশের একটা গাছের সঙ্গে বড়সড় ধাক্কা খেল। সোজাসুজি নয়, বাবা যেদিকে বসেছিল পিছনের সে-দিকটায়। ব্রীজমোহনের মাথা তার সীটের পিছনে ঢলে পড়েছে। তার

কোথাওএতটুকু আঘাত লগেনি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে জানা গেছে সাংঘাতিক রকমের করোনারি অ্যাটাক। দু'দিন বাদে মারা গেল।

…এরও এক বছর বাদে বড় মাসি অর্থাৎ শক্রুর মা মারা যাবার দিনও চন্দ্রা ওই রকম ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দ শুনেছিল। অথচ বড় মাসির অসুখ তারা জানতও না।

আর মায়ের ওই ঘটনা ঘটে যাবার আগে তো…না, চন্দ্রা ভাবতে চায় না। মোট কথা ওই শব্দটার সঙ্গে অশুভ ঘটনার যেন অবধারিত যোগ। নয়তো অশুভ কোনো স্মৃতির যোগ। ঘটনা আব কত ঘটতে পারে। অনেক ঘটেছে। এখন স্মৃতিব যোগই বেশি।

চন্দ্রা নারাযণ এই শব্দ তরঙ্গ ধরে তেমনি কোনো মর্মান্তিক স্মৃতির মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। সে কাঠ হযে বসে আছে। পাশে মহেশ্বর যাদবের দেওয়া ফুলের গোছা পড়ে আছে। ঠুন-ঠুন রিন-রিন শব্দটা আরো বাড়ছে। বেড়ে বেড়ে মাথার ভেতরটা ভরাট করে দিচ্ছে

চোখের সামনে থেকে রাস্তা মুছে যেতে লাগল। নীল আকাশ পাহাড় জঙ্গল—সব।

বেশ বড়-সড় একখানা ঘব। মাঝখানে দামী খাট পাতা। উঁচু গদির শয্যায় এক রমণীর মৃতদেহ। ঘরে অনেক লোক। তার মধ্যে পুলিশের লোকও আছে। ঘরের পিছনের দরজা দুটো চার আঙুল ফাঁক। সেই ফাঁকে বেদনাহত স্তব্ধ বিবর্ণ একখানা মুখ। সেই মুখ চন্দ্রার। তখন চন্দ্রা কেশ-রী। সে ঘরে ঢুকতে পারছে না, ঘরে ঢুকতে চাইছেও না। ভিতরে একটা ছুটে পালাবার তাগিদ। কিন্তু তাও পারছে না। পুলিশ অফিসার তার কাজ করছে। মৃতদেহ দেখছে, শয্যায় যে ট্যাবলেটের শিশিটা পড়ে আছে সেটা তুলে দেখছে। নোট বইয়ে নোট নিতে নিতে ঘরটার চার দিক দেখে নিচ্ছে। শয্যার পাশেই নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে চন্দ্রার বাবা অশোক কেশরী। শয্যায় শয়ান যে মহিলা, আর এ জীবনে ঘুম ভাঙবে না যার, সে মা। বাবার দু'দিকে দাঁড়িয়ে জিত্‌ আর তার বন্ধু জোসেফ মদন বিশ্বাস। বোবা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তারাও।

পুলিশ অফিসার এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাবার দিকে এগিয়ে এলো। বাবা, জিত্ আর জোসেফ তিনজনেই সচকিত। দরজার ফাঁকে চন্দ্রাও চমকে উঠল। কারণ সেই মুহূর্তে একি দেখছে সে ?…হ্যাঁ, মা তো এখনও ওই খাটে শেষ ঘুমে নিশ্চল। অথচ বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মা। তার চোখে আগুন, গলার অনুচ্চ স্বরেও হিসহিস আগুন। একটা আঙুল তুলে বাবাকে বলছে, আমার সব সর্বনাশের জন্য তুমি দায়ী—তুমি – তুমি ! তুমি মাতাল, তুমি লম্পট, তুমি মিথ্যেবাদী ! কোনো দিন একটা সত্যি কথা বলো নি আমার কাছে। সব জেনে সব বুঝেও এতকাল আমি বোকা সেজে থেকেছি। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে সাধ মেটে নি, এখন মেয়েটাকে আগুনে ফেলার মতলব তোমার ? একটা চরিত্রহীন ছেলে… আমি নিজের চোখে দেখেছি ! ওই জিতের হাতে মেয়ে দেবে বলে এক-বারে কথা দিয়ে ফেলেছ ? তোমার স্বার্থ আমি বুঝি না ? বিনে পয়সায় বিলিতি মদ খাইয়ে তোমার মাথাটা এমনিই কিনে ফেলেছে ? তোমার মতো শয়তানের সংশ্রবের কোনো ছেলেকে আমি মেয়ের কাছে ঘেঁসতে দেব ? তার আগে আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যে চিরকাল তুমি শুধু জ্বলবে—জ্বলবে জ্বলবে জ্বলবে !

বাবা দিশেহারা বজ্রাহতের মতো চেয়ে আছে মায়ের দিকে। দু'চোখ বুজে নিজের মাথাটাকেই একটু ঝাঁকিয়ে নিল চন্দ্রা।…না, মায়ের দিকে তো নয়, মা-তো ওই শুয়ে। পুলিশ অফিসারের দিকে…মা ভালো হাতেই শিক্ষা দিয়ে গেছে। বাবা কতটা জ্বলছে চন্দ্রা জানে না। কিন্তু জ্বলছে যে তাতে কোনো ভুল নেই। সেই সঙ্গে নির্মম আক্রোশে বাবাকে মা বিপন্ন করেও গেছে। চিঠি লিখে তার মৃত্যুর জন্য বাবাকে দায়ী করে গেছে। বাবার ছলনা বঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা লিখেছে। তারপর নিজের স্বার্থে একমাত্র মেয়েকে এক চরিত্রহীন ছেলের হাতে বলি দেবার কথাও লিখেছে।

আইনের চোখে এ-রকম চিঠির গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু চন্দ্রা সেজন্য খুব উতলা নয়। মা যে ইদানীং মস্তিষ্কের ভারসাম্য খুইয়ে বসেছিল সেটা সহজেই প্রমাণ হবে। বাবাকে নিয়ে তেমন টানা-হেঁচড়া কিছু পড়বে না।

পাঁচ দিন আগে মায়ের সেই অপ্রকৃতিস্থ মূর্তি দেখে আর গলানো সিসের মতো বিকৃত কথাগুলো শুনে বাবা হতভম্বের মতো চন্দ্রার দিকে চেয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রা কেশরী তক্ষুনি বুঝেছিল, একটা বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে গেছে। মায়ের আচরণ অনেক দিন ধরেই অন্যরকম। কিন্তু সেটা যে এতবড় বিকৃতির দিকে গড়িয়েছে চন্দ্রা ভাবে নি। মা-কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বাবার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছল। জোর করে শুইয়ে দিয়ে কড়া ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। তারপর শহরের সব থেকে নামী মানসিক চিকিৎসকের কাছে ছুটেছে।

কিন্তু রোগ তখন অনেকটাই শিকড় গেড়ে বসেছে। লীলা মাসি আছে, চন্দ্রা আছে, সেইসঙ্গে আরো দুটো নার্স রেখেও মা-কে সামলানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসক মা-কে হাসপাতালে সরাবার পরামর্শ দিয়েছিল। মা-ও কেমন করে বুঝেছিল তাকে আর বাড়িতে রাখা হবে না। তাকে হাসপাতালে সরানোর সময় কেউ আর পেরে উঠল না। সেই অঘটনের আগের দিন মা আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা, শান্ত কাউকে বকাবকি করল না, একটি অসংলগ্ন কথা বলল না। বাবার বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ কখন বসে লিখেছে নার্সরাও বলতে পারল না। আর নিজের মৃত্যুবাণ মা কতদিন আগে সংগ্রহ করে রেখেছিল তারও হদিস মিলল না। বাবা মস্ত ওষুধ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। তার স্ত্রীর পক্ষে কড়া ঘুমের ওষুধের ফাইল যোগাড় করে রাখা কঠিন কিছু নয়।

...বাবাকে নিয়ে মায়ের মনে একটা ক্ষোভ জমাট বেঁধে উঠছে সে আভাস চন্দ্রা বা লীলা মাসি বেশ কিছু দিন ধরে পাচ্ছিল। কিন্তু সেটা যে মায়ের ভিতরটা কত বিষাক্ত করে তুলেছিল ডাক্তারি-পরীক্ষা দেওয়া মেয়েও সেটা কল্পনা করতে পারে নি। পারে নি কারণ মা চতুর কত সে-ধারণাও চন্দ্রার ছিল না। জানল যখন, টের পেল যখন—রোগ মা-কে অনেকখানি খেয়ে দিয়েছে।

...কিন্তু মেয়েকে নিয়ে মায়ের মনে যে ত্রাস আর বাবার প্রতি অভিযোগ তা-ও এই ব্যাধিরই প্রকোপ। নইলে চন্দ্রা যাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক, তাতে বাবার কোনো হাত ছিল না। জীবনের দোসর হিসেবে জিত্

নারায়ণকে চন্দ্রা নিজেই বেছে নিয়েছে এ মা নিজেও জানত। ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর আর জিতের সঙ্গে আলাপের পর দু'জনেই তারা খুশি মনে মত দিয়েছিল। সেটা বছর চারেক আগের কথা। চন্দ্রার সেটা ডাক্তারি পড়ার মাত্র তৃতীয় বছর শুরু···সেই বিয়ে হবে আরো তিন বছর বাদে অর্থাৎ চন্দ্রা ডাক্তারি পাশ করে বেরুনোর পর, মায়ের বরং তাইতেই আপত্তি ছিল। তিন বছর ধরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মেলামেশা করবে অথচ বিয়ে হবে না, এ কেমন কথা! তার থেকে বিয়েটা হয়ে যাক, পড়ায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেইভাবে বুঝেশুনে চলুক।

মায়ের বিবেচনার কথা শুনে জিতের মনে খুশি ধরে না। বিয়েটা করে ফেলতে সে এক পায়ে রাজি। কিন্তু চন্দ্রার দাবড়ানি খেয়ে হতাশ হয়েছিল। তার সাফ কথা ডাক্তারি পাশ করে বেরুনোর আগে নো বিয়ে—নট্ কিচ্ছু!

জিত্ নাছোড়—মা তো বললেন, তোমার পড়ার ব্যাঘাত না ঘটে সে-ভাবে বুঝেশুনে চলতে—এই ক'টা বছরের মধ্যে তোমাকে ওই ইয়েতে না পাঠালেই তো হলো।

চন্দ্রার ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়েছে।—ইয়েতে না পাঠালেই হলো মানে?

—মা-মানে এর মধ্যে দু'জন তিন জন হয়ে না গেলেই তো হলো···।

জবাবে চন্দ্রা হাতের বইটা জোরেই ছুঁড়ে মেরেছিল তাকে।

·

এই লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মূলে নাটকীয় চমক যেটুকু তার পিছনেও ওই মাসতুতো ভাই শত্রুঘ্ন আর মদন বিশ্বাস। পরে জেনেছে দু'জনে জুটি বেঁধে ওই চমকটুকু ঘটিয়েছিল। চন্দ্রা তখন মদন বিশ্বাসকে চিনতও না। আর শত্রুর সঙ্গে মদন বিশ্বাসের খাতির জমানোটা যে ওকে জিত্ নারায়ণের দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য তাও কল্পনার মধ্যে ছিল না।

ডাক্তারি পড়া শুরু করার আগে থেকেই আর পাঁচ-দশটা ছেলের মতো জিত্ নারায়ণের মুখখানাও চন্দ্রার দেখা ছিল। ছেলেদের এই চোখের ভোজের ব্যাপারটা স্কুলের পড়া শেষ হবার আগে থেকে দেখে সে অভ্যস্ত। কারো হাব-ভাব আচরণে বেশি হ্যাংলামো দেখলে বিরক্ত হতো, সোজা ঘুরে

দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকত। বেশির ভাগ ছেলেকে ওটুকুতেই কুঁকড়ে যেতে দেখত। নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে চন্দ্রা তখন থেকেই বেশ সচেতন। কিন্তু নিরীহ গোছের ভক্তদের চোরাচাউনি বরদাস্ত করতে আপত্তি হতো না। বিরক্তির বদলে হাসিই পেত বেশি। ওর মতো এক মেয়ে টান হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাবে, ছেলেরা তখন ফিরে ফিরে তাকাবে না পর্যন্ত, এ-ই বা ভালো লাগে কি করে? আর তাহলে ওই ভক্তদলকে করুণার পাত্রই বা ভাবা যায় কি করে?

জিত নারায়ণের বয়েস এই সব ছেলের থেকে কিছু বেশি হলেও তাকেও রাস্তার নিরীহ ভক্তদেরই একজন ভাবতো চন্দ্রা। বয়সের গুণে লোকটার হয়তো একটু বেশি দেখার লোভ। বরাবর চন্দ্রার খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস। বাড়ির মাইলখানেকের মধ্যে লেক। সপ্তাহের অনেক দিনই লেকে বেড়াতে চলে যেত। জিত্ নারায়ণের নাম ও তখনো জানে না, কোথায় থাকে না থাকে তা-ও না। কিন্তু ও লেকে গেলে দেখা হতোই। পরে জেনেছে তার বাড়ি লেক থেকে দু'মাইলেরও ওপর দূরে। কিন্তু বাড়ি কাছে হোক, দূরে হোক, লোকটা যে স্বাস্থ্য মজুত রাখার জন্য লেকে আসে না সেটা বোঝা যেতো। চোখোচোখি হলেই মনে হতো ওই হ্যাংলা শুধু এটুকুর প্রতীক্ষাতেই বসে ছিল। ফেরার সময় পিছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারতো পনের বিশ গজ তফাতে ওই লোকও ঠিক আসছে। আবার যখন বান্ধবীদের সঙ্গে বিকেলে অন্য পার্কে বেড়াতো সেখানেও অনেক দিনই একে সেখানে দেখা যেতো। চন্দ্রার তাকে একটু টিট করার লোভ যে হতো না এমন নয়। কিন্তু কিছু করতে গেলে বা বলতে গেলে নেহাতই সেটা গায়ে পড়া গোছের হয়ে যাবে। কারণ, এমনিতে মুখ দেখলে মনে হবে কোনো মেয়ে দূরে থাক, সমস্ত দুনিয়ার প্রতি এমন নিরাসক্ত উদাসীন আর বুঝি হয় না। চন্দ্রা ভাবত, যে-হারে ওই লোকের সকাল-বিকেল আর ছুটির দিনে পিছু নেওয়ার ঝোঁক বাড়ছে, টিট করার সুযোগ একদিন না একদিন পেয়েই যাবে। দিন কয়েক আগে এই বাড়ির রাস্তায়ও তাকে হাঁটা-চলা করতে দেখা গেছে।

কিন্তু এ-সবের আড়ালে শক্রু মানে শক্রুঘ্নর যে কিছু ভূমিকা আছে চন্দ্রা

ভাববে কি করে। ওই লোকের সঙ্গে তাকে কখনো দেখে নি, আলাপ থাকা সম্ভব তা-ও কল্পনার বাইরে। খটকা লাগার মতো একটু সুযোগ শক্র অবশ্য চন্দ্রাকে দিয়েছিল। হঠাৎ একদিন জিগ্যেস করে বসেছিল, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার ব্যাপারে তোদের ওই নাইন্‌থ্‌ পেপার না কি বলে তার দরকার আছে কিনা বল্—

নাইন্‌থ্‌ পেপার অর্থাৎ সুপারিশ বা তদ্‌বির। চন্দ্রা যথা সময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার দরখাস্ত দিয়েরেখেছে। প্রিলিমিনারি টেস্ট দিয়েছে, ইণ্টারভিউও হয়ে গেছে। আই. এসসি-র রেজাল্ট থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই ভালো হয়েছে—পাঁচজন নিলেও ওকে না নেবার কোনো কারণ নেই। তাই নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু শক্রর কথায় কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কারণ লেখা-পড়ার ব্যাপারে ও-ছেলে মাথা গলাতেই চায় না। ফিরে জিগ্যেস করেছিল, দরকার হলে তুই কি করতে পারিস?

—সুপারিশের ব্যবস্থা করতে পারি। এক গেলাস জল চুমুক দিয়ে খাবার মতোই যেন সহজ ব্যাপার এটা।

—কি করে? চন্দ্রার কৌতূহল বেড়েছে বই কমে নি। যত হালকা চালে কথা বলুক, একেবারে অসার কথা ও-ছেলে বলে না।

—এক খুড়োর ভাইপোকে ধরে। তোকে সাহায্য করার জন্য খুব ব্যস্ত।

—কে খুড়ো কে ভাইপো?

—মেডিক্যাল কলেজের এক প্রোফেসারের ভাইপো।

চন্দ্রার ভ্রূকুটি স্বাভাবিক!—সেই ভাইপো আমাকে সাহায্য করার জন্য খুব ব্যস্ত?

শক্র সঙ্গে সঙ্গে হাঁসফাঁস করে উঠে বলেছিল, কি বলতে কি বললাম, তোকে নয় আমাকে সাহায্য করার জন্য খুব ব্যস্ত—আমার বোন ডাক্তারি পড়তে চলেছে আনন্দ করে কাকে না এ খবর বলেছি—এক তুই ছাড়া আমাকে কে আর না খাতির করে বল্।

চন্দ্রার এই থেকেই কিছু সন্দেহ হতে পারতো। ওকে আরো জেরার মধ্যে ফেলতে পারতো। কিন্তু শেষের কথায় হেসে ও চোখ পাকিয়েছিল। বলেছিল, প্রোফেসারের ভাইপো সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত না ভাই-ঝি

সত্যি করে বল্।

শক্র তক্ষুনি দু'চোখ বড় বড় করে ফেলেছিল। —ভাই-ঝি মানে ফেমিনাইন জেণ্ডার ?

তর্জনের সুরে চন্দ্রা বলেছিল, দেব ধরে এক থাপ্পড় !

—বা-ব্বা, এক তোকে দেখেই আমার হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি, আবার ও লাইন ! যাক, ভাইপোকে তাহলে বলে দেব দরকার নেই ?

—ভাই-ঝিকে বলবি আমার মাথাটা। তোর মাথার মতো নয়, তাই দরকার নেই।

দিন কয়েক বাদে চন্দ্রা খবর পেল, যারা অ্যাডমিশন পেয়েছে তাদের নাম মেডিক্যাল কলেজের নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রা তক্ষুনি দেখতে ছুটল।

তার নাম গোড়ার দিকেই আছে। নিশ্চিন্ত। আরো অনেকেই প্রত্যাশা নিয়ে নাম দেখতে এসেছিল। কারো খুশি মুখ, কারো বা বিমর্ষ। ফেরার জন্য পা বাড়াতেই সেই ভক্তর সঙ্গে চোখোচোখি—যে লেক আর পার্ক ছেড়ে বাড়ির রাস্তায়ও হাঁটা-চলা শুরু করেছিল। এখন একা নয়, তার সঙ্গে মিষ্টি অথচ দুষ্টু দুষ্টু মুখ আর একটা ছেলে। চন্দ্রা ঘুরে দাঁড়িয়েই বুঝল, দু'জনেই ওরা তাকে দেখছিল।

ভক্তটির মুখ তেমন নিরীহ নয় এখন, উল্টে একটু গোমড়া গোছের। চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে সঙ্গীর দিকে ফিরে চন্দ্রাকে শুনিয়েই বলে উঠল, লিস্টে নাম উঠবে কি করে, সুন্দর মুখের মেয়ে হলেও কথা ছিল—

চন্দ্রা তো শুনেছেই আরো দু'চারজনও শুনেছে। চন্দ্রার ভিতরটা রি-রি করে উঠল। সোজা কাছে এসে বলল, কথাটা কি হলো আর একবার শুনি ?

লোকটার হাঁ-মুখ একেবারে। যেন দুর্বোধ্য ব্যাপার কিছু। আর চন্দ্রাকেও যেন জীবনে এই প্রথম দেখলো। একটু সময় নিয়ে জিগ্যেস করল, কোন্ কথাটা ?

ঝাঁঝালো গলায় চন্দ্রা জবাব দিল, যে কথাগুলো এক্ষুনি আমি শুনলাম —আরো কেউ কেউ শুনলো—বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ?

লোকটাও গম্ভীর এবার। বললো, হচ্ছে।…আমার বোনটা এবারও মেডিক্যালে অ্যাডমিশন পেল না তাই এই বন্ধুর কাছে দুঃখ করছিলাম—

লিস্ট-এ বোনের নাম ওঠে নি চন্দ্রা তা অবশ্য ভাবে নি--কিন্তু ভাই হোক বোন হোক ঠেসটা যে ওকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছে চন্দ্রার তাতে একটুও সন্দেহ নেই। তেমনি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, শাট আপ! নিজের বোনকে নিয়েও অমন কথা বলতে লজ্জা করে না?

আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে গেছল। দিন তিনেক পরের সকালে লেকে দেখা। যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, দেখামাত্র সোজা কাছে এসে দাঁড়াল। একটুও ভনিতা না করে বলল, যদি৺ আমি প্রায় নিরপরাধ তবু প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একটি কথাও না বলে চন্দ্রা সোজা মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ওটুকুতেই নার্ভাস হবার কথা।

কিন্তু খুব হলো না। গম্ভীর বিনয়ে আবার বলল, বোনটা গেলবারে চেষ্টা করেছিল, অ্যাডমিশন হয় নি—বি. এসসি. পড়তে পড়তে এবারেও চেষ্টা করে হলো না, ইন্টারভিউতে খুব খারাপ করল—তাই আমার ওই বন্ধুকে বলছিলাম, দেখতে শুনতে ভালো হলেও প্রোফেসারদের একটু দয়া দাক্ষিণ্য হতো… চেহারাখানা পর্যন্ত ওপরঅলা আমারই মতো হতশ্রী করে পাঠাল।

চন্দ্রা কেশরী অপলক চেয়ে আছে। লোকটার গায়ের রঙ চাপা বটে কিন্তু কুশ্রী আদৌ নয়। বরং মোটামুটি সুশ্রীই বলা যেতে পারে। চোখে চোখ রেখেই চন্দ্রা ঠাণ্ডা জবাব দিল, সেদিন ওই কথাগুলো আমাকেই ঠেস দিয়ে বলা হয়েছিল।

একটু থতমত খেয়ে ওই লোক জবাব দিল, হয়ে, অনেক দুঃখেই মুখ দিয়ে সেদিন অমন বেফাঁস কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল।…এবারও হলো না শুনলেই বোনটা কান্নাকাটি করবে, খাওয়া বন্ধ করবে জানতুম…ঠিক তাই হয়েছিল। যাক, আমি সত্যিই দুঃখিত, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আরো একটু তাকিয়ে থেকে চন্দ্রা আলতো করে বলল, ঠিক আছে,

আসুন—

ঠিক বুঝলো না। —কি বললেন ?

—বললাম ক্ষমা করা গেল, এবারে আসুন— মানে যান।

আর অপেক্ষা না করে চন্দ্রা নিজেই পিছন ফিরলো। ধীরে সুস্থে বাড়ির দিকে চললো। ঘুরে একবার মুখখানা দেখার লোভ হচ্ছিল। আলাপের সুযোগ হবার পর এ-রকম আচরণ আশা করে নি। কিন্তু ঘুরে তাকাবার মতো অমন বোকা বা হ্যাংলা মেয়ে চন্দ্রা কেশরী নয়।

দিন কয়েকের মধ্যেই মেডিক্যাল কলেজের পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল। আর চন্দ্রাও গোড়া থেকেই পড়াশুনায় জোর দিল। এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকার ধাত নয় তার। তাই সকালে বা বিকেলে বেড়ানোও কমে গেল। মাসখানেক বাদে কলেজ থেকে ফেরার পথে ওই লোকের সঙ্গে দেখা আবার। চন্দ্রা এক বন্ধুর বাড়ি হয়ে ফিরছিল। মুখোমুখি দেখা। আর সেই মুহূর্তেই চন্দ্রার কেমন ধারণা, এটা হঠাৎ দেখা নয়। এর পিছনে চেষ্টা বা পরিশ্রম কিছু আছে। একমুখ হেসে পরিচিত জনের মতো সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আর দেখাই নেই একেবারে, লেকেও দেখি না, পার্কেও না···

চন্দ্রার চোখে মুখে ঠাণ্ডা ব্যক্তিত্ব। —দেখার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মনে হচ্ছে···? সামনের দিকে পা বাড়ালো।

ওই লোকও সঙ্গ নিলো। চোখে মুখে বিব্রত ভাব একটু —তা না···। সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ অসহিষ্ণু।—দেখুন, আপনি আমাকে গোড়া থেকেই একটা লোফার-টোফার ঠাউরে বসেছেন বুঝতে পারছি। আমি এম. এ. পাশ, নাম জিত্—জিতেন্দ্র নারায়ণ, কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে কাস্টমস-এ মোটামুটি একটা ভালো চাকরিও করছি—

ঝোঁকের বশে এতটা বলে ফেলে থমকালো। ওই মেয়ে চোখে চোখ রেখে তেমনি চেয়েই আছে।

একটু রয়ে সয়ে মুখও খুলল।—তাহলে ?

—বলছিলাম, আমি একটা থার্ডগ্রেট অভদ্র লোক কিছু নয়।

—বুঝলাম। কিন্তু ভদ্রলোকই বা কি আশা করেন ?

সমান তালের জবাব শুনল, আশা আবার কি করবো, অনেক দিন দূর থেকে দেখেছি, আলাপ করার সাধ হয়েছিল…কিন্তু এত যে অহঙ্কার কে জানত !

চন্দ্রা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এবারে আরো কড়া করে তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল। ভুরুর মাঝে সামান্য ভ্রূকুটি দেখা গেল। ভালো করে দেখছে।—কি নাম বললেন আপনার ?

—জিতেন্দ্র নারায়ণ…ও নাম শুধু চাকরির খাতায়, সকলে জিত্ বলে।

তেমনি চেয়ে থেকে চন্দ্রা বলল, আমাদের প্রোফেসার অফ মেডিসিনের নাম হিতেন্দ্র নারায়ণ…আপনার কেউ হন ?

সঙ্গে সঙ্গে ওই মুখে বিগলিত হাসি। জবাব দিল, আমার কাকা—একেবারে নিজের কাকা। কাকার সঙ্গে এক বাড়িতেই তো থাকি আমি !

চন্দ্রা চেয়ে আছে —ওই কাকা থাকতেও আপনার বোন দু' দুবার মেডিক্যালে চান্স পেল না কেন ?

মুখভাব এবারে বেশ বিব্রত মনে হলো। জবাবও শুনল।—'কাকাকে আপনি এর মধ্যে কতটা চিনেছেন জানি না'…এমনিতে লোক দারুণ ভালো, কিন্তু তার সুপারিশ দূরে থাক, আত্মীয় পরিচয় দিয়ে একটু সুবিধে পাওয়ার চেষ্টা দেখলেও ক্ষেপে যাবে—ওদিকে মানুষ দারুণ সাচ্চা।'

অবিশ্বাসের কথা নয়। প্রোফেসার হিতেন্দ্র নারায়ণ এরই মধ্যে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছেন। ভালো পড়ান, বেজায় গম্ভীর মানুষ। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও ছাত্ররা সসম্ভ্রমে চুপ মেরে যায়। চন্দ্রার স্মরণশক্তি প্রখর। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শত্রু বলেছিল ভর্তি হবার ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজের এক ডাক্তারের ভাইপোও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চেয়েছিল। সোজা তাকিয়ে ঝপ্ করে জিগ্যেস করে বসল, আপনি শত্রুঘ্নকে চেনেন ?

ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু। তারপর ফিরে জিগ্যেস করল, শত্রুঘ্ন ?

চন্দ্রা আর কিছু বলার দরকার বোধ করল না। ধরেই নিল চেনে না। তবু ভাবল শত্রুকে একবার জিজ্ঞেস করবে মেডিক্যাল কলেজের কোন্

প্রোফেসারের ভাই-পো তার বন্ধু। প্রোফেসারদের সঙ্গে একটু খাতির রাখতে পারলে ডাক্তারি লাইনে অনেক সুবিধে। সাজেশান মেলে, দুই একটা দুষ্প্রাপ্য বই-টইও পাওয়া যায়। শত্রুর সেই কথা এতোদিন মনেই পড়ে নি। কিন্তু দিন পনেরর মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা হবে না। ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিংএ গেছে। তার বদলে কলেজের জাঁদরেল প্রোফেসারের আর এক ভাইপোকে পেল। চন্দ্রা এই প্রথম হেসে কথা কইল। বলল, প্রোফেসার নারায়ণের ভাইপো আপনি আগে বলেন নি কেন?

জিত্ নারায়ণ মাথা চুলকে জবাব দিল, বললে কিছু সুবিধে হবে ভাবি নি, নয়তো ঢাক বাজিয়ে পরিচয় দিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রা ভুরু কোঁচকালো। কিন্তু এভাবে খুব একটা রাগ প্রকাশ পেল না তাতে। জিজ্ঞেস করল, আপনি কি সুবিধের আশায় আছেন?

জিত্ কাঁপড়ে পড়ল। আবার সামলেও নিল। ঘাবড়ে-যাওয়া গোছের মুখখানা করে বলল, আপনি এ-ভাবে লোককে বিপাকে ফেলতে পারেন জানলে আলাপ করার লোভ সিকেয় তুলে রাখতুম।

মুখে যা-ই বলুক, আলাপের সুযোগ পেয়ে লোভের কমতি কিছু দেখছে না চন্দ্রা। লোকটা হেসে হেসে আবার বলল, আমার এক ছেলেবেলার বন্ধু আছে, নাম জোসেফ মদন বিশ্বাস—ফোটোগ্রাফার-কাম-আর্টিস্ট—সে আপনাকে একদিন দেখেই আমাকে সাবধান করেছিল, বলেছিল, মানুষ যতই চাঁদ জয় করুক, এই চন্দ্রালোকের দিকে যাস না—মারধর খেয়ে ফিরতে হবে। এখন দেখছি খুব মিথ্যে বলে নি ··

চন্দ্রা বুঝল তার নামটা পর্যন্ত এই লোকের জানতে বাকি নেই। আর যে কথাগুলো বলল তাতেও রাগ হতে পারতো। কিন্তু মনের কথা যে পুরুষ সরাসরি এ ভাবে ব্যক্ত করতে পারে সে আর যা-ই হোক ভীরু চরিত্রের নয়। মেয়েদের হয়তো এই গোছের লোককে একটু বরদাস্ত করতে খুব আপত্তি হয় না। তাছাড়া সে বলল, সে তার কলেজের নামজাদা প্রোফে-সারের ভাইপো শুধু নয়, নিজেও এম. এ. পাশ আর কমপিটিটিভ পরীক্ষায় উতরনো ছেলে। রাগের বদলে চন্দ্রার মজাই লাগছিল। টিপটিপ হেসে জবাব দিল, একটু সাবধান হবেন তাহলে।

তক্ষুনি মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, নিজের ওপর কার না মায়া আছে, সাধ্যমতো চেষ্টা করব সাবধান হতে।

পরের পনের দিনের মধ্যে দিন দুই মাত্র দেখা হয়েছে। শেষের দিনে তো বলতে গেলে বাড়ির দোরে এসে ধরেছে ওকে। আর তারপরেই স্পষ্ট অনুযোগের সুরে বলেছে, মেডিক্যাল কলেজে পড়লেও স্বাস্থ্যজ্ঞান আপনার মোটেই নেই—সকালে লেকে একটু বেড়ানোর কত গুণ তা-ও জানেন না?

চন্দ্রা হেসেই জবাব দিয়েছে, জানি বলেই তো যাই না, অত গুণে কি হবে?

জিতের তক্ষুনি হতাশ মুখ। বড় নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল —জোসেফ ব্যাটা ঠিকই বলেছিল, যতো গুণ ততো ঘুন। এদিকে কাকার সঙ্গে কথা হবার পর থেকেই আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি···আজ মরিয়া হয়ে আপনার বাড়িতেই হানা দিতে যাচ্ছিলাম।

আলাপটাকে অমন তড়িঘড়ি এগোতে দিতে আপত্তি চন্দ্রার। কারণ এখন পর্যন্ত এ-ব্যাপারে নিজের ভিতরে এতটুকু উৎসাহ নেই। কিন্তু কাকা অর্থাৎ প্রোফেসার নারায়ণের কথা শুনে স্বভাবতই উৎসুক একটু। —কাকার সঙ্গে কি কথা?

—আপনার সম্পর্কে কথা। বলতেই কাকা ঠিক চিনল। বলল, বেশ ব্রাইট মেয়ে। কিছু বোঝার দরকার-টরকার হলে আমাকে যেন বলে। এ-রকম সুযোগ কাম্য বটে। হঠাৎ এই লোক কাকার কাছে তার কথা বলতে গেল কেন সেই জেরায় না ফেলে খুশির ভাব দেখালো।—ধন্যবাদ।···বুঝব কি, দোকানে অর্ডার দিয়েও এখনো বই-টই ঠিকমতো হাতে পাচ্ছি না। ওঁকে প্রণাম করতে যায় একদিন, আপনার বোনের সঙ্গেও আলাপ হবে।

জিত্‌ নারায়ণ কি কারণে যেন হোঁচট খেল একটু। তারপরেই তড়বড় করে বলল, খুব ভালো কথা, যেদিন খুশি যাবেন, কিন্তু বইয়ের জন্য আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না, কি বই দরকার লিস্ট দিন আমি কাকার থেকে চেয়ে এনে দেবো।

—উনি দেবেন ?

—আমি চাইলে নিশ্চয় দেবে—না দিলে লোপাট করে আনতে কতক্ষণ!

চন্দ্রা ধাক্কাই খেল একটু।—লোপাট করে আনবেন মানে…স্যারকে না বলে সরাবেন ?

হেসে তক্ষুনি সায় দিল। বলল, নিশ্চয় সরাব, বই চুরির বা বুককিপিং-এর একটা আলাদা মর্যাদা আছে। আপনি লিখে দিন।

আগ্রহ দেখে চন্দ্রার মনে হলো, অনায়াসে পারে। মুখের দিকে সোজা চেয়ে থেকে জবাব দিল, ও-ভাবে আমার বই পাওয়ার দরকার নেই।

শুনেই সবিনয়ে বলল, তাহলে চেয়ে নেব। কি বই বলুন—

চন্দ্রা হেসে ফেলল। —আপনাকে খুব বিশ্বাস হচ্ছে না, তার থেকে আগে বরং আপনার কাকাকে জিগ্যেস করবেন, দু'দশ দিনের জন্য এক-আধখানা বই দিতে পারেন কিনা। দোকান থেকে সাপ্লাই পেলে আর দরকার হবে না। ওঁর সাবজেক্টেরই বই, ওঁর কাছে থাকা সম্ভব। একটু থেমে তেমনি হাসিমুখেই আবার বলল, আজ আপনাকে বাড়িতে ডাকতে পারছি না, গেস্ট আসার কথা আছে—আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

হালকা চালে ফিরে চলল। চন্দ্রা সত্যি কথা বলে নি। যার আসার কথা সে গেস্ট নয়—শত্রুঘ্ন। আর সে আজ ফিরবে বলে এই লোককে বাড়িতে আনল না এও ঠিক নয়। আসল কথা, হুট্ করে এতটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিতে রাজি নয়। একবার বাড়ি ঢুকতে পেলে না-ছোড় হয়ে ওঠার মতোই স্বভাব লোকটার।

শত্রু ফেরে নি। রাতেও তার টিকির দেখা পাওয়া গেল না। পরদিন অর্থাৎ ছুটির দিনটার দুপুরেও না। ও এলে দুজনে মিলে একটা সিনেমা দেখার ইচ্ছে ছিল। চন্দ্রা বেরিয়ে পড়ল। একা সিনেমায় ঢুকতে ইচ্ছে করল না। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিক এটা। বেশ ঠাণ্ডার আমেজ। বেলা-শেষের রোদটুকু ভালো লাগছে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর ক্লান্ত লাগছিল। সামনে ভেনাস পার্ক। বিকেল না হতে এখানে ছেলে-মেয়ের ভিড় লেগে থাকে। সেই হিসেবে পার্কটার নাম সার্থক। কিছুটা বেপরোয়া রোমান্সের

হাওয়া বয় এখানে। গার্জেনরা অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের দূরের পার্কে পাঠায়—এ-পার্কের এমনি সুনাম। এই পার্ক এ-সময় আজ প্রায় ফাঁকা! চন্দ্রা অবাক প্রথম। তারপর মনে পড়ল পিছনের মাঠে আজ এখানকার মেয়েদের জেনারেল স্পোর্টস। মস্ত ব্যাপার। শহরের মেয়ের দঙ্গল আজ সেখানে। অতএব ছেলের দলও।

ভেনাস পার্কে ঢুকে চন্দ্রা রঙবাহার ফুলের ছোট গাছগুলোর পাশে একটা পাথরের বেঞ্চএ বসল। এখানকার এই বিরল নির্জনতা ভারী ভালো লাগছে। একটু বাদে হাসি পেল। রেলিং-এর ওপাশের রাস্তা দিয়ে দু'একজন করে যারা যাচ্ছে তারা সকলেই ফিরে ফিরে দেখছে ওকে। কি ভাবছে চন্দ্রা অনায়াসে আঁচ করতে পারে। ভাবছে সুদিন দেখে কোনো বিরহিণী দয়িতের প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। মনে হতে জিত্‌নারায়ণের মুখখানা চোখে ভাসল। খুব মন্দ নয়, ধৈর্যও আছে, কিন্তু অনায়াসে তাকে সেই লোক ভাবতে ভিতরটা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠছে না। মনে হলো লোকটা এখনো প্রত্যাশীর মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অদৃশ্য মানুষটার উদ্দেশেই চন্দ্রা একপ্রস্থ জিভ ভেঙচে দিল। জিত্‌নারায়ণের থেকেও চন্দ্রার তার কাকাকে হাত করার আগ্রহ আপাতত বেশি।...গতকালের ক্লাসে ভদ্রলোক ওকে একটু বিশেষ করেই লক্ষ্য করছিলেন। লেকচারের ফাঁকে ফাঁকে ওকে দেখছিলেন। চিরাচরিত গম্ভীর যদিও, তবু চন্দ্রার একটু ব্যতিক্রমের মতো লাগছিল। কি মনে হতেই চন্দ্রা ভুরু কুঁচকে ফেললো।...ভদ্রলোক যদি ভেবে থাকেন এই মেয়ে তাঁর ভাইপোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! জিত্‌ নারায়ণ নামে মানুষটার ওপর চন্দ্রা অকারণেই বিরূপ হয়ে উঠলো।

বেশ বিমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সচকিত। ওই ফুলের ঝুপড়ির পাশে ছোট কালো মতো কি দেখা যাচ্ছে, একই সঙ্গে মাটিতে উপুড় হয়ে শোওয়া একখানা মুখও চকিতে সরে গেল। পর মুহূর্তে কালো জিনিসটাও আড়ালে টেনে নেওয়া হলো। চন্দ্রা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারখানা বুঝল। খুব চোরের মতো কেউ তার ফোটো তুলে নিল। রাগে মুহূর্তে চোখ-মুখ লাল। এক ঝটকায় উঠে দ্রুত এগিয়ে এলো। ঝুপড়ি ফুলগাছের ও-ধারে

লোকটা তখন মাটিতে বসা। পালাবার ফাঁক খুঁজছে।

চন্দ্রার সেই মূর্তি দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে উঠে দাঁড়ালো। জামার বুকের কাছটায় কিছু ঘাস মাটি লেগে আছে। অপ্রস্তুত হলেও ঠোঁটে কাচা হাসি। চেহারাও মিষ্টি। কিন্তু এমন ইতর হতে পারে আর এমন দুর্জয় সাহস হতে পারে ভাবা যায় না। তার ওপর কিনা নির্লজ্জের মতো বলল, থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম!

কিন্তু ম্যাডাম কি করতে পারে লোকটার ধারণার বাইরে। আচমকা ছোঁ মেরে চন্দ্রা তার হাত থেকে ক্যামেরাটাই ছিনিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, ও-কি ও-কি!

আগুন ঝরা গলায় চন্দ্রা বলে উঠলো, কি বুঝতে পারছ না? এটা এক্ষুনি মাটিতে আছড়ে ভাঙা হবে—এবার বুঝতে পারছ?

এমন লোককে আপনি বলে সম্মান দেখাতেও আপত্তি চন্দ্রার। সত্যি সত্যি আছড়ে ভাঙতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ মনে হলো লোকটাকে কোথায় যেন এর আগে দেখেছে। কোথায় মনে করা গেল না। রাগে তখনো মুখ লাল।

লোকটা আবারও আর্তনাদই করে উঠলো, সর্বনাশ! ওই ক্যামেরা আমার প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, ও শত্রুঘ্ন ভাই! কোথায় আছ শিগগীর এসো—বাজী ধরতে গিয়ে আমার যে বারোটা বেজে গেল!

চন্দ্রা যথার্থ হকচকিয়ে গেল। লোকটা যেদিক ফিরে চিৎকার করল সেদিকে তাকিয়ে দেখে একটা ছুঁচলো ঝাউগাছের আড়াল থেকে শত্রুর হাসিমুখখানা বেরিয়ে এলো। বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য সে ছুটেই এলো। অবাক হবার ভান করে বলল, কি ব্যাপার, জোসেফদার ক্যামেরা তোর হাতে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে ওই লোক করুণ গলায় বলল, ম্যাডাম ওটা আছড়ে ভাঙতে যাচ্ছে—বাজী ধরে আমার ঘাট হয়েছে, রক্ষা করো ভাই।

শত্রুর মুখে জোসেফদা শুনে ভিতরে ভিতরে চন্দ্রারও একটু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এই নাম কার মুখে শুনেছে…। মনে পড়লো কার মুখে।

জিত্ নারায়ণ তার এক ফটোগ্রাফার-কাম-আর্টিস্ট বন্ধুর কথা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে পড়লো, অ্যাডমিশন লিস্টে নাম দেখতে গিয়ে জিত্ নারায়ণের পাশে একেই দেখেছিল।

মুখখানা একটু ভারিক্কি করে শত্রুঘ্ন জানান দিল, জোসেফদার দোষ নেই, দূর থেকে তোকে ওই বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে বলল, ফোটো তোলার জন্যে হাত নিশপিশ করছে—তক্ষুনি আমি টোপ ফেললাম তুলতে পারলে কুড়ি টাকা বাজী—আর সাহস দিলাম ভয়েরই বা কি আছে, আমি তো আছি। যাক, ক্যামেরাটা দিয়ে দে—

শুনে চন্দ্রার রাগ বাড়লো বই কমল না। ঝাঁঝিয়ে উঠলো, এই ক্যামেরা তাহলে তোর মাথায় ঠুকে ভাঙব!

দু'হাতে মাথা চেপে শত্রুঘ্ন জিভ দিয়ে জোরে দমকলের অ্যালার্মঘণ্টি বাজিয়ে দিল। তারপর একমুখ হেসে বলল, আগুন নেভাতে আসছে—

চন্দ্রার হাসিই পেয়ে গেল। কিন্তু হাসতে খুব একটা রাজি নয়। ক্যামেরাটা জোসেফের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ওই নেগেটিভ আমাকে এক্ষুনি দিয়ে দিতে হবে!

ক্যামেরার দখল পেয়ে জোসেফ মদন বিশ্বাস হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। তারপরেই ডবল কাঁচুমাচু মুখ আবার।—এখানে এটা খুললে গোটা রিলটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে···অনেক ভালো ভালো ফোটো তুলেছিলাম—

—যাক নষ্ট হয়ে আমি এক্ষুনি চাই!

মুখখানা আরো অসহায় করে মদন বিশ্বাস বলে উঠলো শত্রু—তুই এই শত্রুতা করলি!

আশ্বাসের সুরে শত্রুঘ্ন বলল, ঘাবড়াচ্ছ কেন, দমকল এসে গেছে যখন আগুন নিভল বলে। এক গাল হেসে চন্দ্রার দিকে ফিরল, তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন, এখানকার মেয়েরা সব কাড়াকাড়ি করে জোসেফদার কাছে ফোটো তোলাতে চায়—

চুলের ঝুঁটি ধরে ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রার। এখানে সম্ভব নয়। রাগটা মুখে প্রকাশ করল।—বাড়ি চল্, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!

এবারে শত্রুর অসহায় মুখ।—অ্যাদ্দিন বাদে ঘরে ফিরলাম, দেখতে না পেয়ে তোর খোঁজে এই পার্ক পর্যন্ত ধাওয়া করলাম—আর তোর এই ব্যাভার?

সঙ্গে সঙ্গে মদন বিশ্বাস ওর সমস্যা সমাধান করে দিল। বলল, আজ আর তাহলে তোমার বাড়ি গিয়ে কাজ নেই ব্রাদার—রাতটা তুমি আমার ওখানেই কাটিয়ে দাও।

মুখখানা যেমন করে থাক, চন্দ্রার রাগ পড়েই আসছে। কিন্তু হঠাৎ আবারও কি মনে পড়তে তেমনি গম্ভীর মুখেই শত্রুঘ্নর দিকে ফিরে ঝপ করে জিগ্যেস করে বসল, এঁর বন্ধু জিত্‌নারায়ণকে তুই চিনিস?

শত্রুঘ্ন জবাব দেবার আগেই নিরীহ গলায় মদন বিশ্বাস বলে ফেলল, না চেনার কি আছে, শত্রুই তো জিতের আশা ভরসা এখন। আমি জিতের বাড়ি গেলে ব্যাটা শুধু চা খাওয়ায়, আর শত্রু গেলে এখন থেকেই শালার আদর—সরি ম্যাডাম, সরি!

চন্দ্রার সমস্ত মুখ লাল আবার। চোখের আগুনে একবার মদন বিশ্বাসের মুখখানা ঝলসে দিয়ে আবার শত্রুঘ্নর দিকে ফিরল। স্পষ্ট মনে আছে জিত্‌ নারায়ণকে জিগ্যেস করেছিল শত্রুঘ্নকে চেনে কিনা—অম্লানবদনে ওই লোক মিথ্যে কথা বলেছে। বলেছে চেনে না। ওর অগোচরে এরা এই রকম একটা কারসাজিতে মেতেছে!

চোখোচোখি হতেই শত্রু যেন ডুকরে উঠলো।—সর্বনাশ করলে জোসেফদা, একেবারে সর্বনাশ করলে—এবারে আমাদের তিনজনেরই দফা রফা!

ভ্যাবাচাকা খাওয়া মূর্তি জোসেফেরও। চন্দ্রার দিকে এক পলক চেয়ে থেকে বলল, না বুঝে কিছু একটা করে ফেললামই তো মনে হচ্ছে…আবার দমকল ডেকে দেখবে?

চন্দ্রা আগুন চোখে জোসেফের দিকেই চেয়ে আছে। ষড়যন্ত্রের কথা ভাবতে গিয়ে তার আরো কিছু মনে হচ্ছে। প্রোফেসার নারায়ণকে প্রণাম করতে আর জিত্‌ নারায়ণের বোনের সঙ্গে আলাপ করতে একদিন বাড়ি যাবে শুনেই লোকটা কেমন ধড়ফড় করে উঠেছিল। বলেছিল, বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই, সে নিজেই বই এনে দেবে। প্রস্তুত হবার সময় না

দিয়ে ওই জোসেফ মদন বিশ্বাসের চোখে চোখ রেখেই আবার ধমকে ওঠার মতো করে অতর্কিত প্রশ্ন ছুঁড়ল।—জিত্ নারায়ণের বোন এখন মন ঠাণ্ডা করে কলেজে পড়ছে?

হকচকিয়ে গিয়ে মদন বিশ্বাস বলে ফেলল, জিতের বোন!…তার আবার বোন এলো কোত্থেকে!

কান ঝালাপালা করে শত্রুর মুখে দমকলের অ্যালার্ম বেজে উঠলো। তক্ষুনি মাটিতে আছড়ে-পড়া মুখে মদন বিশ্বাস সামাল দিতে চেষ্টা করল, ও—জিতের বোন! বোন থাকবে না কেন—নিশ্চয় আছে—ভারী ভালো মেয়ে—খুব ঠাণ্ডা মেয়ে—

চন্দ্রার বুঝতে আর কিছু বাকি নেই। তপতপে চোখে মদন বিশ্বাসের নাচার মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে রুক্ষ গলায় এবার জিগ্যেস করল, মেডিক্যাল কলেজে তার প্রোফেসার কাকা বলে কেউ আছে না তা-ও নেই?

লোকটা ধড়ফড় করে উঠলো।—বা রে জলজ্যান্ত কাকা আছে—হিতেন্দ্র নারায়ণ—প্রোফেসার অফ মেডিসিন—একেবারে নিজের কাকা—রক্তের যোগ। জিত্ তো তার কাছে তার বাড়িতেই থাকে!

এটা মিথ্যে নয় চন্দ্রা গতকাল তাঁর ক্লাস করেই বুঝেছিল। কিন্তু রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে এখনো। একবার শত্রুর আর একবার এই লোকের মুখ ঝলসে দিতে লাগল।

জোসেফ বলে উঠলো, ওই হতভাগার কপালে এরপর কি আছে ঈশ্বর জানে। ত্রস্তে নিজের কপালে বুকে আর দু'কাঁধে হাত ছুঁইয়ে ক্রস্ করে নিল। তারপর উদাত্ত সুরে বলে উঠলো, দেখো ম্যাডাম, যে-ক্ষমাগুণে মেয়েদের প্রতিদ্বন্দ্বিনী নেই সেই ক্ষমাগুণে নিজেকে তুমি উদ্ভাসিত করো—আমি আর একখানা ফোটো তুলে নিই!

ঘুরে চন্দ্রা হনহন করে পার্কের বাইরে চলল। পিছন থেকে শত্রু ডাকছে, ওই লোকটাও ম্যাডাম-ম্যাডাম করে ডাকছে। চন্দ্রা সোজা বেরিয়ে এলো। একটা সাইকেল রিকশয় উঠলো।

সোজা বাড়ি।

নিজের ঘরে বসেও রাগে জ্বলতেই চেষ্টা করছে। রাগ হচ্ছে না এমন নয়. কিন্তু এরই মধ্যে ভিতরের কোথাও একটা হাসির উৎস-মুখও খুলে যাচ্ছে। চন্দ্রা রাগবে না হাসবে? ওকে নিয়ে ওই তিনজন এমন নিঃশব্দে এই গোছের একটা ষড়যন্ত্রে মেতে আছে এ কি ভাবা যায়! চন্দ্রার হাসি পাচ্ছে আবার শত্রুর মাথাটা ছাতু করতে ইচ্ছে করছে। হাসি পাচ্ছে আবার ওই অন্য দু'জনের ওপর একটুও সদয় হতে পারছে না।

শত্রু বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরল টের পেল। চন্দ্রা এগিয়ে আসা দূরে থাক, দরজাও খুলল না। শত্রুও এই রাতে আর দরজায় ধাক্কা দেবে না জানা কথা। এতক্ষণ ধরে তিন জনে মিলে শলা পরামর্শ চলছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরদিন যেমন ভোরে ওঠে তেমনি উঠলো। বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে তখন। রেডি হয়ে চন্দ্রা বেরিয়ে পড়ল। সোজা লেকের দিকে। জিত্ নারায়ণ আসবেই ধরে নিয়েছে। চন্দ্রাও এরপর কিছু বোঝাপড়া করতে চাইবে ধরে নিয়েই আসবে।

হিসেবে ভুল হয় নি। এসেছে। দূর থেকেই ওকে দেখল। দূর থেকে চোখোচোখি হতে দু'হাত জুড়ল। কিন্তু চন্দ্রা সোজা মুখ ফিরিয়ে নিল। পলকে যেটুকু দেখে নিয়েছে তাতেই মনে হয়েছে সমস্ত রাত ভালো করে ঘুমোতে পারে নি।

চুপচাপ এসে চন্দ্রা একটা খালি বেঞ্চিতে বসল।

পায়ে পায়ে জিত্ এসে সামনে দাঁড়ালো। দু'হাত তেমনি জোড় করা।

চন্দ্রা সোজা মুখ তুলে তাকালো তার দিকে।

জিত্ বলল, ক্ষমা—

চাপা অথচ ঝাঁঝালো সুরে চন্দ্রা ফিরে জিগ্যেস করল, কিসের জন্য ক্ষমা, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলার জন্যে না জোচ্চুরি ধরা পড়ার জন্যে?

আরো বিনয়ে জিত্ নারায়ণ বলল, ওই ইয়ের শাস্ত্রে বলে এ-ব্যাপারে চুরি মিথ্যে জোচ্চুরি সব চলে—সবই ক্ষমার যোগ্য।

অর্থাৎ বলতে চায় প্রণয় শাস্ত্রে সব চলে। চন্দ্রা সত্যিই তেতে উঠছে। কড়া গলায় বলল, ওই শাস্ত্র নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন, আমি না!

—আমি ভেবেছিলাম সে-রকম সময় পেলে আপনিও আস্তে আস্তে মাথা ঘামাবেন—জোসেফ রাসকেলটার জন্য সব ভেস্তে গেল।

ভিতরের সেই হাসির উৎস-মুখে আবারও নাড়া পড়ছে। কিন্তু চন্দ্রা আর প্রশয় দিতে রাজি নয়। সোজা মুখের দিকে তাকালো।—ক্ষমা চান ?

—আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্ষমা চায়।

—বেশ। ক্ষমা করতে রাজি আছি। এক শর্তে—এরপর আপনি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করবেন না।

এ-রকম শর্তের জন্য জিত্ নারায়ণ প্রস্তুত ছিল না। জবাবটা গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো।—এর থেকে এই লেকের জলে ঝাঁপ দেওয়া তো সহজ!

রাগত মুখেই চন্দ্রা বলল, ঝাঁপ দিন তাহলে।

জিতের আরো ব্যাজার মুখ।—ঝাঁপ দিলেই বা কি হবে, ভালো সাঁতার জানি, ঠিক ভেসে উঠব।

চন্দ্রা উঠে পড়ল। আর কথা বলারও প্রবৃত্তি নেই যেন। হনহন করে হেঁটে চলল। রাগ হচ্ছে বটে সেই সঙ্গে হাসিও পাচ্ছে।…ধরে বেঁধে প্রেমের ফাঁদে ফেলার জন্য তিন-তিনটে মাথা কাজ করছে আর ও কিছু জানেই না। শত্রু কি করে ওই দলে গিয়ে ভিড়ল ভেবে পায় না।

ঘরে ফিরে চন্দ্রা শত্রুঘ্নর দেখা পেল না। সকালে ডিউটি পড়লে খুব ভোরেই বেরুতে হয়। কিন্তু টানা ট্রেনিং-এর পরে গতকাল ফিরেছে, আজই সকালে ডিউটি পড়ার কথা নয়। কত আর পালিয়ে বাঁচবে, ওকে ভালো হাতেই দেখে নেবে।

কিন্তু চন্দ্রা চাক বা না চাক, জট যে ভালো হাতে পাকাচ্ছে সেটা সেদিন কলেজে এসে অনুভব না করে পারা গেল না। দুপুরে একটা থেকে দুটো প্রোফেসার হিতেন্দ্র নারায়ণের ক্লাস ছিল। তার পড়ানোয় এ-দিন কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। অর্থাৎ আজ আর আগের দিনের মতো থেকে থেকে লক্ষ্য করলেন না। গম্ভীর মুখে যেমন যত্ন করে পড়ান তেমনি পড়িয়ে গেলেন। আর সকলে মাথা গুঁজে নোট করে গেল।

ক্লাস শেষ হতেই চন্দ্রা সচকিত। গুরুগম্ভীর ভদ্রলোক সোজা তার সামনে

এসে দাঁড়ালেন।—চন্দ্রা কেশরী?

হকচকিয়ে গিয়ে চন্দ্রা মাথা নাড়ল। ওই নাম তারই বটে।

—সী মি ইন মাই রুম···উইল ইউ?

নিজের অগোচরে চন্দ্রা মাথা নাড়ল। ভদ্রলোক চলে গেলেন। অনেক ছেলেরই চোখ এখন চন্দ্রার মুখের ওপর। আয়নায় না দেখেও চন্দ্রা বুঝতে পারছে এই মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে একটা দুর্মুখ ছেলে কাছে এসে গম্ভীর বিস্ময়ে রসিকতা করল, কিব্যাপার মিস কেশরী—এইচ. এন. তো চোখ বুজে পড়ান—সেই চোখ হঠাৎ তোমার দিকে গিয়ে পড়ল কেন?

বিড়ম্বনা সামলে চন্দ্রা সপ্রতিভ অথচ ঘাবড়ে যাবার মতো করে জবাব দিল, চোখ বুজে পড়াতে পড়াতে আমাকে ঘুমুতে দেখে ফেলেছেন বোধ হয়—অদৃষ্টে কি আছে কে জানে।

ছেলেরা অবাকই একটু। হিতেন্দ্র নারায়ণের ক্লাসে এই মেয়ে ঘুমোচ্ছিল এ-ও বিশ্বাস করা শক্ত।

চন্দ্রা বেরিয়ে এসে পায়ে পায়ে প্রোফেসারের ঘরে এলো। ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চুরুট টানছেন। ওকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। গম্ভীর মুখে এই বোধহয় প্রথম একটু হাসির আভাস দেখল চন্দ্রা।

—সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, বোসো।

চন্দ্রা বসল। ভদ্রলোকের হাসি ছোঁয়া দু'চোখ তার মুখের ওপর।

—বুঝতে-টুঝতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

চন্দ্রা মাথা নাড়ল। অসুবিধে হচ্ছে না।

—বই-টই কি পাচ্ছ না শুনলাম—কি বই?

চন্দ্রা চেষ্টা করছে স্বাভাবিক হতে। কিন্তু সেটা এই পরিস্থিতিতে খুব সহজ নয়। একটা মেডিসিনের বইয়ের নাম করল। মৃদু গলায় বলল, দোকানে পাচ্ছি না···আনিয়ে দেবে বলেছে।

—আমার কাছে আছে। যে ক'দিন না পাও রাখতে পারো। মুখের দিকে আর একটু চেয়ে থেকে এবারে বেশ প্রসন্ন গলাতেই বললেন, যাক

এবারে ওই গাধাটার কথা শোনো, আমার তিন-তিনটে মেয়ে—ছেলে বলতে ওই ভাইপো। তার হয়ে আমি কিছু সুপারিশ করছি না। ও-রকম সিলি ভাঁওতাবাজীর জন্য তুমি তোমার দিক থেকে ঠিকই করেছ—আর আমিও ওকে সে-কথা বলেছি। কিন্তু ও-ছেলে নাছোড়বান্দার মতো তোমাকে শুধু একটা কথা বলার জন্য আমাকে ধরে পড়েছে—বিপাকে পড়ে যত ছেলেমানুষী করে থাকি, আমাকে যদি তুমি লোফার-মার্কা না ভাবো কাকা, তাহলে তাই শুধু মিস চন্দ্রাকে জানিয়ে দাও।···নিজের ভাইপো, কি আর বলি···খুব অন্যায় করেছে, বাট হি ইজ নট্ রিয়েলি দ্যাট্ ব্যাড।···ঠিক আছে, এইজন্যেই ডেকেছিলাম—বই পেয়ে যাবে।

চন্দ্রা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সমস্ত মুখ লাল। যা করে বসল, এই পরিস্থিতিতে তার অর্থ যে অনেক দূর গড়ায় সেটা পরক্ষণেই বুঝেছে। কাছে এসে নত হয়ে ভদ্রলোকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

গম্ভীর হিতেন্দ্র নারায়ণের সমস্ত মুখ খুশিতে ভরে উঠলো। চুরুট নামিয়ে বললেন, দেন আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ হ্যাভ ফরগিভ্ন্ হিম···ইউ আর কাইণ্ড অ্যাণ্ড নাইস ট্যু।

মুখ লাল করেই চন্দ্রা বেরিয়ে এলো। এ-সব কথার পর মরতে কেন প্রণাম করতে গেছল। জিত্ নারায়ণের ওপর যতো রাগ হচ্ছে ততো নিজের ওপরেও। কিন্তু বেলা শেষে ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় রাগের তলায় হাসি ঠিকরোচ্ছে বেশি।

বাড়ি এসে বসার ঘরের দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালো। সোফায় মায়ের পাশে বসে শত্রু মা-কে সোৎসাহে একটা ফোটো দেখাচ্ছে। বলছে, মেয়ের এমন ফোটো আর একখানাও দেখেছ মাসি—কেমন কায়দা করে তুলিয়েছি যদি জানতে!

মা ফোটো দেখছে। তারও খুশি মুখ। বলছে, সত্যি তো খুব সুন্দর হয়েছে—কে তুলল?

—জোসেফ দা, জোসেফ মদন বিশ্বাস—পেশাদার ফোটোগ্রাফাররাও তার মতো ফোটো তুলতে পারে না।

শব্দ না করে চন্দ্রা পিছন দিক থেকে এগিয়ে এলো। তারপর এক ঝট্কায়

সামনে এসেই বই ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুঠো মুঠো করে শত্রুঘ্নর ঝাঁকড়া চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে সোফা থেকে ধুপ করে একেবারে মাটিতে এনে ফেলল তাকে। তারপর এক হাতে চুলের মুঠি ধরে থেকে অন্য হাতে গুমাগুম কিল আর ঠাস ঠাস চড়। শত্রু বিপর্যস্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, মাসি—মেরে ফেলল!

মা হকচকিয়ে গেছল। ছাড়াতে চেষ্টা করে এবারে ধমকে উঠলো, কি হলো—পাগলের মতো করিস কি তুই?

চেঁচামেচিতে ওদিক থেকে লীলা মাসিও ছুটে এসেছে। দৃশ্য দেখে সেও থ। ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রা অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। মুক্তি পেয়ে শত্রুঘ্ন ফের সোফায় উঠে বসে নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হাসিমুখে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, অত অবাক হচ্ছ কেন মাসি, সকলকে প্রেম বিলিয়ে স্বয়ং যীশু কি পুরস্কার পেল জানো না?

মা তখনো মেয়ের এই আচরণের তলকূল পাচ্ছে না। তার আগেই চন্দ্রা মায়ের হাত থেকে ছোঁ মেরে ফোটোটা নিয়ে চার টুকরো করে ছিঁড়ে জোরে শত্রুর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলো, তুই আমাকে নেগেটিভ এনে দিবি কি না?

মা বিমূঢ়। শত্রু হাসিমুখে তারই শরণাপন্ন।—হাঁ করে আছ কি মাসি, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখো—ও ডাক্তার হয়ে বেরুলে কারো প্রাণে বাঁচার আশা আছে?

মা-ও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে উঠলো, এমন সুন্দর ফোটোটা এভাবে ছিঁড়লি—তোর কি সত্যি মাথা খারাপ হলো?

সমান ঝাঁঝে চন্দ্রা বলল, হ্যাঁ হলো। তারপরেই আবার শত্রুর মুখোমুখি।—তুই আমাকে ওই ফোটোর নেগেটিভ এনে দিবি কি না আমি জানতে চাই।

—তুই আমাকে অত কাঁচা ছেলে পেয়েছিস নাকি! হৃষ্টবদনে শত্রু পকেট থেকে একটা ছোট্ট সবুজ খাম বার করল।—নেগেটিভ আমি নিয়েই এসেছি—তা'বলে এটা তোর হাতে দেবার মতো আহাম্মক আমি না। মাসি, এটা সাবধানে রাখো—মেয়ের মাথা ঠাণ্ডা হলে ওই ফোটো আবার

প্রিন্ট করিয়ে এনে দিও—তখন দু'চোখ ভরে নিজেই নিজের ফোটো দেখবে।

সোফা ছেড়ে উঠে এসে খামটা মায়ের হাতে দিয়ে আবার হেসে বলল, অত রাগের কারণ বুঝতে পারছ না—তোমার মেয়ে তখন কোন্ রাজ্যে বিচরণ করছিল ও-ই জানে—সেই ফাঁকে অজান্তে জোসেফদাকে দিয়ে এই ফোটো তোলানো হয়েছে বলে এত ঝাঁঝ।

চন্দ্রা পারলে আবারও ওকে ধরে ঘা-কতক লাগায়। ঝাঁঝালো মুখে মাটি থেকে বইখাতা কুড়িয়ে সোজা হতেই দরজার ও-ধার থেকে ডাক শানা গেল, শত্রুঘ্ন বাড়ি আছ?

চন্দ্রা মুহূর্তের জন্য নিশ্চল। এই গলা বিলক্ষণ চেনা। মায়ের চোখও দরজার দিকে। শত্রুঘ্ন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। আরে এসো এসো—জিত্‌দা এসো—মেঘ না চাইতেই জল! দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ও হাত ধরে জিত্ নারায়ণকে ঘরে নিয়ে এলো।—মাসি, এই আমার আর চন্দ্রার বন্ধু জিত্‌দা—জিত্ নারায়ণ, কাস্টমস-এর অফিসার—আমার মতো গবেট ভেবো না, যাকে বলে বিদ্যের জাহাজ—কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে বুক ঠুকে চাকরি আদায় করেছে। আমি আর চন্দ্রা কত দিন জিত্-দাকে বাড়ি আসতে বলেছি—এত দিনে সময় হলো।

কিল চড়ে চন্দ্রার হাতটাই ব্যথা ব্যথা করছে। সেই হাতই আবার নিশপিশ করে উঠলো।

জিতের এক হাতে একটা মোটা বাঁধানো বই। কি বই দেখা মাত্র চন্দ্রা বুঝল। হাসি-হাসি মুখে লোকটা মায়ের দিকে এগিয়ে গেল। পা ছুঁয়ে দিব্বি প্রণামও করে উঠলো। মা বলল, থাক-থাক, বোসো—

জিত্ নারায়ণ চন্দ্রার দিকে ফিরল। বইটা বাড়িয়ে দিয়ে নিরীহ মুখে বলল, কাকা পাঠিয়ে দিলেন—

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দিকে ফিরে শত্রুঘ্ন আবার তড়বড় করে উঠলো, জিত্‌দা'র কাকাকে জানো তো মাসি—চন্দ্রাদের ডাকসাইটে প্রোফেসার—ভদ্রলোক কতভাবে যে সাহায্য করছেন তোমার মেয়েকে—

মা খুশি মুখে বলল, ওর কথা তো তোরা কখনো আমাকে বলিসই নি—

গম্ভীর মুখে চন্দ্রাকে হাত বাড়িয়ে বইটা নিতে হয়েছে। তারপর ইচ্ছে করেছে ওটা গায়ের জোরে শত্রুর মুখে ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপও নেই। মা-কে বলল, গণ্যমান্য অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করো মাসি—
মা চলে গেল। ঘরের তিনজনই তখনো দাঁড়িয়ে। শত্রুঘ্ন হাসিমুখে নালিশ করল, একটু আগে আমাকে মেরে আধমরা করেছে চন্দ্রা, আর, আর ওই দেখো জোসেফদার তোলা ফোটোর কী হাল।
জিত্ মাটিতে ছড়ানো ফোটোর টুকরোগুলো দেখল। বলল, তাহলে আমারও তো মানে মানে সরে পড়াই ভালো।
—নিশ্চয়! শত্রুঘ্ন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।—তবে পালানোর আগে একটু কাটলেট মুখ করে যাও—আমি প্যালেটেবল থেকে খানকতক গরম কাটলেট ভাজিয়ে আনি—খাসা বানায় ওরা—
বলেই ঘর থেকে উধাও। মা-কে খাবার আনতে পাঠিয়েও এ-ভাবে চলে যাওয়ার অর্থ না বোঝার মতো বোকা নয় চন্দ্রা। শত্রুর ওপর রাগে সত্যিই জ্বলছে এখন।
ভয়পাওয়া গোছের মুখখানা করে জিত্ বলল, আমি তাহলে কি করি এখন?
প্রায় ঝাঁঝালো সুরেই চন্দ্রা পাল্টা প্রশ্ন করল, কি ইচ্ছে?
—বসার ইচ্ছে···আর কাটলেট খাওয়ার।
চন্দ্রা থমকে মুখের দিকে তাকালো। তার থেকেও ঢের বেশি কিছু ইচ্ছে ওই লোকের চোখের তারায় চিকচিক করছে। দরজার দিকে একটু এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালো।—ইচ্ছেতে কেউ বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে আমার এখনো মুখ-হাতে জল দেওয়া হয় নি।
উদাস মুখ করে জিত্ বলল, শুধু মুখ হাত কেন, আমার তো মনে হচ্ছে মাথায়ও জল দিতে হবে।···অথচ কাকা যখন বইটা দিয়ে আসতে বলল আমি ভাবলাম সব মেঘ কেটে গেছে।
চন্দ্রা আবারও ফোঁস করে উঠলো, কাকাকে এর মধ্যে টেনে আনতে লজ্জা করে না? বই হাতে করে এলেই আমি একেবারে জল হয়ে যাব? তাঁকে কি বোঝানো হয়েছে আমি জানতে চাই!
অম্লানবদনে জবাব দিল, বোঝানো হয়েছে তার ভাইপোর যায়-যায় দশা।

মোক্ষম দাওয়াই ভেবে কাকা আমার হাতে তোমার ওই মেডিসিনের বই তুলে দিল —

—তুমি! তোমার! এখানে তোমারটা কে?

আঙুল দিয়ে জিত্ মেঝের ফোটোর টুকরোগুলো দেখিয়ে দিল। তেমনি ঝাঁঝালো গলায় চন্দ্রা বলল, তার কি হাল চোখে পড়ছে না?

—পড়ছে। তোমার হাতে আমার ওই হালই হবে বুঝতে পারছি।

—তাহলে আর দাঁড়িয়ে কোন্ ভরসায়?

নিরীহ দুই চোখ চন্দ্রার মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগলো। সত্যিই বেরিয়ে যেতে চন্দ্রাই বিপাকে পড়ল। শত্রু কাটলেট আনতে গেছে সেটা কিছু নয় — ওকে এই গোছেরই আক্কেল দিতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রার। কিন্তু মা ও-দিকে জলযোগের ব্যবস্থা করতে গেছে। তাকে কি বলবে? রাগের মাথায় এতটা করে ফেলে আরো রাগ হচ্ছে চন্দ্রার। দ্রুত জানালায় এসে দাঁড়ালো। চুপচাপ লোকটা চলেই যাচ্ছে বটে।

—শোনো!

জিত্ ঘুরে দাঁড়ালো।

—প্রোফেসার নারায়ণ কাল শুনবেন বই দিতে এসে আমার মা-কে পর্যন্ত অপমান করে যাওয়া হয়েছে!

—আমি বলব আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিথ্যেবাদীর কথা উনি বিশ্বাস করবেন না!

জিত্ তক্ষুনি মাথা নেড়ে সায় দিল। — তা অবশ্য ঠিক, মাকেই তাহলে বলে যাই তাঁর মেয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ফিরে এলো।

চন্দ্রা ঝাঁঝালো হুকুম করল, ওই রাসকেলটা না ফেরা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকো!

দুপ দাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সোজা দোতলায় নিজের ঘরে। হাতের বই খাতা টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলল। তারপরেই চোখে মুখে হালছাড়া হাসি। এই রাগের তলায় এতো হাসি জমাট বেঁধে

ছিল নিজেও জানত না। হাসির দমকে বিছানায় গড়াগড়ি। ধরে বেঁধে প্রেম এই পর্যায় গড়াতে পারে তাই বা কে জানত? শক্রুকে আর এক দফা মাটিতে শুইয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। তবু খারাপ যে লাগছে না অস্বীকার করবে কি করে?

জিত্ নারায়ণ এর পর দিনকে দিন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠতে লাগলো। রোজ সকালে চন্দ্রাকে লেকে আসতেই হবে। একদিন না গেলে সে বাড়িতে এসে হাজির হবেই। তখন সকালের পড়াটাই মাটি। চন্দ্রা তাকে সমঝে দিতে ছাড়ে না। বলে, তুমি চাকরি করো, সময়ে অফিসে হাজিরা দিলেই হলো, আমার পড়াশুনা আছে না?

জিতের তক্ষুনি কাঁদ কাঁদ মুখ।—পড়াশুনার জন্য আমাকে বিসর্জন দেবে? চন্দ্রা আরো জোর দিয়ে বলে, একদিন দু'দিন নয়, এখনো সাড়ে চার বছরের জন্য বিসর্জন দেব। তোমার জন্য আমাকে যদি ফেল করতে হয় তো বিসজনের মেয়াদও বাড়বে।

জিত্ বলে, এমন যন্ত্রণার থেকে কড়িকাঠে ঝুলে পড়া ভালো। ও-পাট চুকিয়ে দিয়ে যত খুশি পড়াশোনা করো না!

দু'মাস না যেতে দু'পাঁচ কথার পরেই জিতের মুখে কেবল বিয়ের কথা। কাকার দোহাই দেয়। আর ওর কাকিমাও নাকি বলে শুভকর্ম এ-ভাবে ফেলে রাখতে নাই। শক্রু পাজিটাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়। চন্দ্রা তাকে চোখ রাঙায়, তোর জন্যে আমি কেমন মেয়ে ধরে নিয়ে আসি হাড়ে হাড়ে টের পাবি। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে না মারে তো কি বললাম।

জবাবে মুখ ভিঁয়ে ও দমকলের ঘন্টি বাজিয়ে দেয়।

বিকেলের দিকে এক-একদিন জোসেফ মদন বিশ্বাসকে নিয়ে হাজির হয় জিত্। ওই আর একখানা ঝ'ড়ো হাওয়া। প্রথম দিন বাড়ি এসেই বলেছিল, শুধু একজনকে কৃপা করলে হবে না ম্যাডাম—ওই হতভাগার মতো প্রথম দিন তোমার ফোটো তুলতে গিয়ে আমিও চন্দ্রাহত—নিলে দু'জনকেই নিতে হবে।

চন্দ্রা সভয়ে এদিক্-ওদিক তাকায়, বাবা মা বা লীলা মাসির কানে গেলে

কি ভাববে ঠিক নেই। পরে গলা খাটো করে জবাব দিয়েছিল, তোমাকে তো ওর আগেই নিয়েছি—তুমি এক নম্বর, ও-ই বরং দু'নম্বর।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মদন বিশ্বাস ধাক্কা মেরে মেরে জিত্‌কে ঘরের বার করে দেবেই। সঙ্গে সঙ্গে তর্জন, এক নম্বর ঘরে আছে দেখেও তুই এখানে কোন্ আক্কেলে—আমি বাইরে আমার জুতো রেখে দিচ্ছি—জুতো না দেখলে তখন ঘরে ঢুকবি—পঞ্চ পাণ্ডবরা কি করত মনে নেই? ফের এ-রকম হলে তোকে অজ্ঞাতবাসে পাঠাব বলে দিলাম!

পরে হাসিমুখে ওই মদন বিশ্বাসই অনেকবার জিতের হয়ে সুপারিশ করেছে! বলেছে, বেচারার হার্টের রোগ ধরাতে না চাও তো বিয়েটা সেরেই ফেলো ম্যাডাম।

রাগ দেখিয়ে চন্দ্রা জবাব দিয়েছে, ধরুক, আমি হার্টের রোগেই স্পেশা-লাইজ করব না হয়।

...বিয়েটা চটপট ঘটিয়ে ফেলার জন্য জোসেফ মদন বিশ্বাস আর ওই শত্রু পাজিতে মিলে কি কাণ্ডই না করেছিল। চন্দ্রার হাঁসফাস দশা একে-বারে। ওর মতো বুদ্ধিমান মেয়েও ব্যাপারটা ধরতে পারে নি। বোঝার পর মনে মনে স্বীকার করতেই হয়েছিল ওই মদন বিশ্বাস রাতকে দিন করার মতোই এক্সপার্ট ফোটোগ্রাফার বটে।

সেই কাণ্ডর মূলেও একখানা ফোটো।

...চন্দ্রা সেদিন সন্ধ্যায় সবে পড়তে বসবে, শত্রু ঘরে ঢুকল। রাত ন'টার আগে বাড়িতে সচরাচর তার টিকির দেখা মেলে না। জিগ্যেস করলে বলে দমকল আপিসের চাকরি, হাড় নিঙড়ে জল বার করে ছাড়ে। তাই সেদিনের ফেরাটা অসময়ের। চন্দ্রা টিপ্পনীর সুরে বলল, আজ তোর ঘড়ি চলছে তো?

মুখখানা সেদিন অস্বাভাবিক গম্ভীর শত্রুর। জবাব দিল, আমার ঘড়ি ঠিকই চলছে, তোর ঘড়িটা বড় বেশি পিছিয়ে পড়ছে। তোর সঙ্গে দুটো কথা বলব বলেই তাড়াতাড়ি চলে এলাম...মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিস তো বলি।

চন্দ্রা স্বভাবতই উৎসুক একটু। এ ধরনের কথা ওর মুখে বড় একটা শোনা যায় না। ভুরু কুঁচকে জবাব দিল, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারব না তোর কি বলার আছে ?

তেমনি গম্ভীর মুখে শক্র চন্দ্রার বিছানায় বসল। চন্দ্রাও তার দিকে চেয়ার ঘুরিয়েছে। শক্র বলল, শোন, তোদের ব্যাপারটা লোকের চোখে খুব ভালো দেখাচ্ছে না···মেশোমশাইকে পাঁচ জনে চেনে, বাড়ির একটা সুনাম আছে—

চন্দ্রা অবাকই বটে।—আমাদের ব্যাপারটা মানে ?

—তোর আর জিত্‌দার মেলামেশার ব্যাপারটা। আমার মতে বিয়েটা চটপট সেরেই ফ্যাল।

এটুকুতেই চন্দ্রার ক্ষেপে ওঠার দাখিল।—আমরা কি-রকম মেলামেশা করি যে লোকের চোখে ভালো দেখাচ্ছে না ? পড়ার সময় ইয়ারকি দিতে এসেছিস ?

শক্রর চাউনি এবারে রীতিমতো থমথমে। -ইয়ারকি? জামার তলা থেকে একটা ফোটো বার করে সামনে ধরল।—মেসো মাসিকে তাহলে এটা দেখাই ?

বিমূঢ় চন্দ্রা চেয়ার ছেড়ে কাছে এলো। ফোটোটা ওর হাত থেকে নিয়ে দেখা মাত্র আরো হতভম্ব। ভেনাস পার্কের এক বেঞ্চিতে চন্দ্রা বসে আছে। তার নিবিড় সান্নিধ্যে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জিত্‌। ঠোঁটের নাগাল না পেয়ে গালে চুমু খাওয়ার লোভ। হাঁ হয়ে চন্দ্রা যাচাইয়ের চোখে ফোটোটা ভালো করেই দেখল। কিন্তু অবিশ্বাস করার মতো কিছুই খুঁজে পেল না। অথচ বিশ্বাসই বা করে কি করে ?

ফোটোটা বিছানায় ফেলে চিরাচরিত রাস্তাই ধরল চন্দ্রা। দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে ওকে মাটিতে টেনে নামালো। তারপর চিৎকার করে উঠলো, বল্ শিগগীর কি হয়েছে, নইলে তোর একদিন কি আমার একদিন—

অমন আক্রমণের পরেও শক্র গম্ভীর।—ফোটো কখনো মিথ্যে বলে না—এ ফোটোও জোসেফদা ভেনাস পার্কের ঝোপের আড়াল থেকে তুলেছে। আর আমাকে এটা দিয়ে বলেছে, বোনের বিয়ে চটপট সেরে

ফ্যালো—দিনে দুপুরে এই কাণ্ড।

জবাবে এক হাতে চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে পিঠে এলোপাথাড়ি কিল চড়। সেই সঙ্গে চিৎকার।—আজ তোকে আমি খুন করে ফেলব—শিগ্‌গীর বল্ এ-রকম ফোটো কি করে হলো—

মেয়ের গলা শুনে ও-দিক থেকে মা ছুটে এলো। এ-রকম দৃশ্য দেখতে খুব অনভ্যস্ত নয়। তবু মেয়েকেই ধমকে উঠলো, অতবড় ছেলের গায়ে হাত তুলিস কোন্ আক্কেলে—এখনো সেই ছেলেমানুষ আছিস? ছাড় শিগ্‌গীর—কি হয়েছে?

শত্রুকে ছেড়ে চন্দ্রার আগে ফোটোটা সামলাতে হলো। সেটা টেবিলে বই চাপা দিয়ে মায়ের উদ্দেশেই ঝাঁঝিয়ে উঠলো, এখনো কিছু হয় নি, ভালো চাও তো ওকে বাড়ি থেকে তাড়াও শিগ্‌গীর—নইলে আমার হাতেই কোন্‌দিন খুন হবে বলে দিলাম।

মা এবার শত্রুর দিকে ফিরল।—কি হয়েছে? কি করেছিস?

গম্ভীর মুখে শত্রু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো! চন্দ্রাকে বলল, কি হয়েছে মাসিকে বলি তাহলে? সাহস থাকে তো মাসিকে দেখা ওটা। চন্দ্রা আবারও তেড়ে আসতে শত্রু ঘর ছেড়ে পালালো।

শত্রুর মুখেই চন্দ্রা পরে শুনেছে কি করে কি হলো। চন্দ্রার সেই ভেনাস পার্কে তোলা ছবির নেগেটিভ ফেরত দিলেও মদন বিশ্বাস ওই ফোটো থেকে আরো একটা নেগেটিভ করে রেখেছিল।…দিন তিনেক আগে পুরুষের কয়েকটা পোজ্-এর মডেল দরকার বলে ভাঁওতা দিয়ে জিতের কয়েক রকম পোজ্-এ ফোটো তুলেছে। আসলে তার শুধু দরকার ও-রকম ঝুঁকে পড়া ফোটো। সেটা পেয়ে কাঁচি চালিয়ে দুটো ফোটো ঠিক যেমনটি চায় তেমনটি করে একসঙ্গে জুড়ে আবার ফোটো তুলেছে। দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না এর মধ্যে জোড়াতাপ্পির কোনো ব্যাপার আছে!

…ছ'টা মাস না যেতে শত্রুর ওই অঘটন। বুকের ভিতরটা শুধু চন্দ্রারই দুমড়ে মুচড়ে যায় নি। জোসেফ মদন বিশ্বাস আর জিত্‌ও স্তব্ধ একেবারে।

সত্যিই শক্রুকে ওরা ভালবাসতো। ও চলে যাবার এক বছরের মধ্যে জিত্‌ আর বিয়ের কথা তোলে নি।

কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই। আর অপেক্ষা করতে পারছে না। একদিন মদন বিশ্বাসের সামনেই ওকে বলেছিল, তোমার জন্মে এরপর আমিও শক্রুর মতো কিছু অঘটন বাঁধিয়ে বসব।

এ-প্রসঙ্গে ওই নাম চন্দ্রার ভালো লাগে নি। ভ্রূ কুঁচকে ফিরে বলেছে, শক্রু আমার জন্য অঘটন বাঁধিয়েছে ?

—তা কেন। তোমার জন্য আমার ও-রকম অঘটন কিছু ঘটে যেতে পারে।

—কি অঘটন ?

—ধরো তোমার কথা ভাবতে ভাবতে বিমনা হয়ে পথ চলতে চলতে গাড়ি চাপা পড়ে গেলাম।

চন্দ্রা হেসে ওঠার আগেই গম্ভীর মুখে মদন বিশ্বাস বন্ধুকে আশ্বাস দিয়েছে।—তুই নিশ্চিন্ত হয়ে চন্দ্রার কথা ভাবতে ভাবতে বিমনা হ'—হয়ে গাড়ি চাপা পড়—চন্দ্রার জন্য ভাবতে হবে না, আমি আছি।

জিত্‌ ওকে তেড়ে মারতে গিয়েছিল।

…চন্দ্রার মায়ের মন জানার পর জিত্‌ আবার ঘন ঘন বিয়ের কথা তুলছিল। মায়ের মত, বিয়ে হবে যখন হয়েই যাক। বছরের পর বছর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মেলামেশা করবে অথচ বিয়ে সিকেয় তোলা থাকবে সেটা মায়ের পছন্দ ছিল না। চন্দ্রা তবু কানে তোলে না দেখে জিত্‌ মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলেছিল, চন্দ্রা ডাক্তার হয়ে বেরুনোর আগে দু'জন তিনজন না হয়ে গেলেই তো হলো…বিয়েটা হতে দোষ কি ?

জবাবে চন্দ্রা ওকে হাতের বই ছুঁড়ে মেরেছিল।

…মা অবুঝ ছিল না এমনিতে। সেই অপবাদ চন্দ্রা অন্তত মা-কে দিতে পারবে না। নইলে মায়ের সামনে জিত্‌কে নিয়ে ও কি বিপাকেই না পড়ে গেছল একদিন।…বাবা টুরে, লীলামাসী দু'দিনের ছুটি নিয়ে তার কোন্‌ আত্মীয়ের বাড়ি গেছে। মা-কে তার এক বান্ধবী টেনে নিয়ে গেছল ঠাকুর দেবতার কি একটা সিনেমা দেখাতে। শো ভাঙবে রাত আটটায়।

সন্ধ্যার পর চন্দ্রা নিয়মিত পড়ার বই নিয়ে বসেছিল। পাটিপে দোতলায় উঠে নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে জিত্ ঘরে ঢুকল। বাবা মা বাড়ি থাকলে ওকে তখন ওপরের ঘরেই ডাকা হতো। বাবাই ডাকত। বলত, বাইরের ছেলের মতো নিচে বসে থাকবে কেন—

সেই লোক নিজেই আজ সোজা ওপরে উঠে এসেছে। হাসছে মিটিমিটি। নিচে চাকরটার কাছে নিশ্চয় শুনে এসেছে একমাত্র ও ছাড়া আর কেউ বাড়ি নেই। চন্দ্রা ঝাঁঝ দেখিয়ে বলেছে, খুব সাহস দেখি, আমার এখন অনেক পড়া আছে, যাও—

মুখখানা গো-বেচারা করে জিত্ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, আমিও তো আছি।

—উঁহুঁ, তুমি এখন নেই। পালাও বলছি!

—কোথায়?

—তোমার বন্ধুর কাছে চলে যাও। মোট কথা 'এখন আমি একটা চ্যাপ্টার শেষ করব।

মুখ কাঁচুমাচু করে জিত্ বলেছে, আমি ভেবেছিলাম একটা চ্যাপ্টার শুরু করবে—

—কি চ্যাপ্টার?

—এক গেলাস জল। বেজায় তেষ্টা পেয়েছে···

—এই ঠাণ্ডায় তোমার বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেল? বিরক্তির ভাব দেখিয়েই চন্দ্রা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতে গেছে। আর পরের মুহূর্তেই বুঝেছে কোন্ ফাঁদে পড়ল। দু'হাতে সাঁড়াশির মতো বুকের ওপর এমন আটকে ফেলল যে নড়ার উপায় নেই। সে-চেষ্টার ফুরসতও পেল না। চোখের পলকে দুই ঠোঁটের গ্রাসে সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ খানিক! সেই সুযোগে বাহুর শেকল আরো নিবিড় হয়ে উঠলো। একের পর এক চুমু খেয়ে চলল। আর বুঝি থামবেই না।

খানিকক্ষণ ধরে বিপর্যস্ত হবার পর চন্দ্রা আচমকা এক ধাক্কায় তিন হাত দূরে সরালো তাকে। জিত্ উল্টে পড়তে পড়তে বাঁচল। সেই ফাঁকে চন্দ্রা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়েই বাইরে থেকে ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করল।

তার পরেই বজ্রাঘাত মাথায়। মা শেষ সিঁড়ি টপকে সবে বারান্দায় পা দিয়েছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত তখন সোয়া সাতটাও না। হঠাৎ কি হলো না বুঝে মাথমকে দাঁড়িয়ে গেছে। পরক্ষণেই বুঝেছে নিশ্চয়। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক মুখেই জিজ্ঞেস করেছে, ঘরে কাকে আটকালি, জিত্ এসেছে বুঝি ?

চন্দ্রা কি করে যে পরিস্থিতি সামলাবে ভেবে পাচ্ছে না। নালিশের সুরে বলে উঠলো, কি জ্বালাতন করছে দেখো না মা, চুপচাপ বসে থেকে পাঁচ মিনিটও পড়তে দিচ্ছে না আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু মেয়ের মুখ চোখের দিকে চেয়ে মায়ের আঁচ করার কথা জ্বালাতনটা কি গোছের। আঁচ যে করেছে একটু বাদেই চন্দ্রা তা-ও নিঃসংশয়ে বুঝেছে। এগিয়ে এসে মা নিজেই দরজা দুটো খুলে দিয়ে সস্নেহে জিত্‌কে বলেছে, কিছু মনে কোরো না, মেয়ের পড়া-পড়া বাই···চা খেয়েছ ?

—আজ্ঞে না। ভিতরে হাঁসফাঁস দশা। বাইরে নিরীহ মূর্তি।—এক পেয়ালা চা চাইলাম বলেই তো রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

—আচ্ছা আমি করে পাঠাচ্ছি। ধমকের সুরে ফিরে দাঁড়িয়ে মেয়েকে বলেছে, এক পেয়ালা চা করে দিতে কতক্ষণ লাগে—আয়, নিয়ে যা। সিনেমা দেখতে বসে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল আর ভালোও লাগছিল না তাই উঠে এলাম—এসে না পড়লে ছেলেটা এক পেয়ালা চা-ও পেত না।

মুখে মা যাই বলুক, মেয়ের ওভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করা আর তার আবিরগোলা মুখ দেখে আঁচ কিছু করেছেই। আরো বোঝা গেছে, মেয়ের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিতে দিতে মায়ের গজগজানি শুনে। ···বলছিল, ব্যাটাছেলেকে এ-ভাবে ঝুলিয়ে রাখা কেন, সব দোষ তোর ···কতদিন বলেছি বিয়েটা হয়ে যাক তারপর যত খুশি পড়—না আগে তোর ডাক্তার হওয়া চাই—যেমন বাপ তেমনি মেয়ে।

সুযোগ পেলে মা তখন থেকেই বাবার দোষ টেনে আনত। সেটা এই পরিণতির দিকে গড়াচ্ছে কল্পনার মধ্যেও ছিল না। কিন্তু যে ছেলের

সম্পর্কে মায়ের এত সুবিবেচনা সেই জিতের ওপরেও মা এতটা ক্ষেপে গেল কেন চন্দ্রার কাছে সেটাই দুর্বোধ্য।

…মায়ের সেই ঘর। সেই শয্যা। খাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে চন্দ্রা আধা-আধি শোয়া। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। হাতে মোটা ইংরেজি বই একটা। পড়ছে। আবার মাঝেমাঝে পাশের দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে মায়ের বড় ফোটো একখানা। মা তার দিকেই চেয়ে আছে। চন্দ্রা বইয়ের দিকে চোখ ফেরালো।

'…অ্যাঙ্গুইশ অফ মাইণ্ড হ্যাজ ড্রিভেন থাউজেণ্ডস্ টু সুইসাইড…মানসিক যাতনা হাজার হাজার মানুষকে আত্মঘাতী করেছে, কিন্তু দেহের যন্ত্রণা বোধহয় কাউকেই সে-পথে ঠেলে দেয় নি। সুখের দুটো দাবী। দেহের স্বাস্থ্য আর মনের স্বাস্থ্য। একটা চাই, আর একটা চাই-ই। যত সমৃদ্ধ মন হোক, জট পাকাতে দিলে বা ওতে ধুলো জমতে দিলে দেখতে দেখতে সেটা নিষ্ফলা পতিত জমির মতো হয়ে যাবে। মনের ভোগের দোসর দেহ, মন মরলে দেহকেও সে অনিবার্য সহমরণের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই…'

চন্দ্রা বিষণ্ণ মনে পড়া শুরু করেছিল। এই বই এখন ধ্যানজ্ঞান। যত পড়ছে মনে হচ্ছে মায়ের মস্তিষ্কের এতবড় গোলযোগের হদিস এ বই থেকে পাবে। ঘরে কেউ এসেছে মনে হতে বই নামালো। চায়ের পেয়ালা হাতে লীলামাসী ঘরে ঢুকেছে। দীর্ঘকাল ধরে এই পরিবারের সঙ্গে আছে। কেউ তাকে পরিচারিকা ভাবে না। মাঝবয়সী, মোটামুটি সুশ্রী। একসময় মা এই লীলামাসিকেও দারুণ ভালবাসত। সাংসারিক ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করত। কিন্তু এই অসুখটার সময় মা তার ওপরেও বিষ হয়ে উঠে-ছিল।

বই পাশে রেখে খাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে আর একটু সোজা হয়ে বসল চন্দ্রা। হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিল। দৃষ্টি তার মুখের ওপর। মায়ের মাথার গণ্ডগোল দেখা দিতে এই লীলামাসি অষ্টপ্রহর মাকে আগলে রাখত। মা কত গালাগাল করত, কত অপমান করত—লীলামাসি কানেও নিত না। এই একজনের কাছে বাড়ির সকলের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

না, অকৃতজ্ঞ কেউ নয়। চন্দ্রা তো নয়-ই। তবু গোটাকতক প্রশ্ন ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে। মায়ের মাথার গণ্ডগোলটা বড় হঠাৎ ধরা পড়েছে। কথা বলতই না প্রায়, গুম হয়ে থাকতো। কিন্তু তখনো বড় কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কা কারো মাথায় আসে নি। এমন কি ডাক্তার হতে চলেছে যে সেই চন্দ্রারও না। বিপর্যয় যখন এলো ভালো করে চিকিৎসারও সুযোগ মিলল না। ভালো করে বুঝতে না বুঝতে মা তার দেহের ওপর চরম শোধ নিয়ে গেল।

কিন্তু মায়ের মনে জট পাকানোর জন্য তারাও কি দায়ী নয় ? এই লীলা-মাসী দায়ী নয় ? জিত্ দায়ী নয় ? বাবা দায়ী নয় ? ও নিজেও দায়ী নয় ? হয়তো সাধারণ বিচারে দোষী কেউ নয়। কিন্তু সামান্য বিবেচনার অভাবে, এই মনের জগতটাকে একটু বোঝার অভাবে কত বড় অঘটন না ঘটে যায়।

সোজা লীলামাসির মুখের দিকে চেয়ে চন্দ্রা ভাবল একটু।—আচ্ছা লীলা-মাসি, গেলবারে বাবা তিনদিনের জন্য টুরে বেরিয়ে স ৎদিনের দিন ফিরল —তোমার মনে আছে ?

প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝে লীলামাসী জবাব দিলো, থাকবে না কেন···

সাদাসিধে মুখ চন্দ্রার, কিন্তু দু' চোখ উৎসুক একটু।—পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যার পর মা বাইরে বেরিয়েছিল, রাতে ঘরে ফিরতেই তাড়াতাড়ি কাছে এসে তুমি খবর দিলে, বাবা ট্রাঙ্ক-কল করেছিল, কোম্পানির জরুরী কাজে একেবারে আটকে গেছে, পরদিনও ফিরতে পারে আবার দুই একদিন দেরিও হতে পারে···মনে আছে ?

লীলামাসির দু' চোখ মুখের ওপর থমকালো এবার।—আছে···কেন ?

—বাবা কি সত্যি ট্রাঙ্ক-টেলিফোন করেছিল ?

লীলামাসীর মুখে বিড়ম্বনার ছায়া। চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারল না।

চন্দ্রা আবার বলল, আমি জানি আমার কাছে তুমি মিথ্যে বলবে না··· তা ছাড়া মিথ্যে বলার দরকারই বা কি, মায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার জন্য আর অন্য দিকে বাবাকে আগলানোর জন্য মাকে তুমি ওই ট্রাংক কলের

কথা বলেছিলে—ঠিক কি না ?

শুকনো মুখে মাথা নাড়ল লীলামাসী। ঠিক।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে তেমনি শান্তগলায় চন্দ্রা আবার বলল, তোমার কোনো দোষ ধরছি না লীলামাসী, যা করেছ ভালো ভেবেই করেছ আমি জানি।...আচ্ছা বাবার প্রায়ই রাত হতো আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে, ডিনারে আসত না, বাবা ফোন করত, আগে ভাগে গিয়ে তুমি ফোন ধরতে, বাবা কোনো ড্রিংক-এর পার্টি-টার্টিতে বসে গেছে তুমি ঠিক টের পেতে—কিন্তু মাকে এসে বলতে বাবা আপিসের মিটিং-এ আটকে আছে—সত্যি না ?

লীলামাসীর ফাঁপরে পড়ার দাখিল। কিন্তু চন্দ্রা এবারে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়েই আছে দেখে বিড়বিড় করে জবাব দিলো, ফোনে উনিই দিদিকে যা হোক কিছু বলে বোঝাতে বলতেন, তা ছাড়া ওই রকম কিছু না বললে দিদি হয়তো ডিনারে বসতেনই না।...না খেয়ে শুয়ে থাকতো।

চন্দ্রার গলার স্বর এবারে সামান্য অসহিষ্ণু।—কিন্তু মিথ্যে বলে কি লাভ হতো, বাবা বাড়ি ফিরলেই তো মা টের পেত ?

লীলামাসী জবাবদিহি করল, হয়তো ভাবতেন মিটিং বা কাজের চাপের পরে ক্লান্ত হয়ে কোথাও গিয়ে একটু খেয়ে-টেয়ে এসেছেন।

চন্দ্রা কোনো মন্তব্য করল না। শুধু চেয়েই আছে। আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। শেষের ক'টা দিন এই লীলামাসীর ওপরেও মাকে সময় সময় ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে দেখেছে কেন? মায়ের সে-আচরণ দুর্বোধ্য লাগত চন্দ্রার কাছে। এখন স্পষ্ট। বাবাকে নিয়ে মায়ের সন্দেহ শেষের দিকে এই লীলামাসী পর্যন্ত গড়িয়েছিল। রোগ তো বটেই। চন্দ্রার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে এই রোগের খবরও কি লালামাসী জানত না ? বুঝত না ?

থাক। চন্দ্রার ধারণা লীলামাসী জানত, বুঝত। না, সে রকম কোনো সন্দেহের ঠাঁই চন্দ্রার মনের তলায় নেই, মায়ের সন্দেহটাকে ও রোগ বলেই বিশ্বাস করে। জেরায় পড়ে এমনিতেই বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে। লীলামাসী হয়তো ভেবেছিল, মায়ের এই রোগের খবর প্রকাশ পেলে

চিকিৎসা হিসেবে তাকে হয়তো বাড়ি থেকে সরে যেতে বলা হতো। কিন্তু মায়ের মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের এই রোগ হয় কেন, মনে এরকম জট পাকায় কেন?

লীলামাসী বলল, বসার ঘরে জিত্ তোমার বাবার সঙ্গে কথা কইছে, তোমার কথা জিগ্যেস করছিল।

চায়ের পেয়ালা হাতে চন্দ্রা বিমনা একটু। বলল, বাবার সঙ্গে কথা শেষ হলে পাঠিয়ে দাও।

লীলামাসী ঘর থেকে যেতে পারলে বাঁচে, তাড়াতাড়ি চলে গেল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে চন্দ্রা আবার দেয়ালে মায়ের ফোটোর দিকে তাকালো। মায়ের এই মুখে কোনো রোগ বা কোনো বিকৃতির ছায়াও নেই।

দরজার বাইরে জিত্ নারায়ণ।

হাতের খালি পেয়ালাটা পাশের ছোট টেবিলে সরিয়ে রাখতে রাখতে চন্দ্রা ডাকল, এসো—

আগের মতোই আবার খাটে ঠেস দিয়ে তার দিকে ফিরল। জিত্ এগিয়ে আসতে বলল, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো—

খাটের হাত দেড়েকের মধ্যে চেয়ারটা টেনে নিয়ে জিত্ বসল।

তাকে আর একবার দেখে নিয়ে চন্দ্রা বলল, মুখ শুকনো কেন?

—না…ওটা কি বই?

হাতের মোটা বইটা উল্টে তার দিকে ধরল চন্দ্রা, টেক্সট বুক অফ ক্লিনিকাল সাইকোলজি।

জিতের মুখে হাসি টানার চেষ্টা।—সবে পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরুলে, এখনই আবার বই কি?

চন্দ্রা জবাব দিলো না। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। জিজ্ঞেস করল, বাবার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

আমতা আমতা করে জিত্ জবাব দিলো, তোমার কথাই—

চন্দ্রা চেয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস।—আচ্ছা, তোমাদের সব কথা আর চিন্তা-ভাবনা আমি দু'কথায় শেষ করে দিচ্ছি।

বিয়ে হবে।

জিতের মুখে হঠাৎ খুশির ছটা। চেয়ারটাকে আরো আধ হাত কাছে টেনে নিয়ে আসতে বাধা পড়ল। একটা আঙুল তুলে হাসি-মাখা চোখে চন্দ্রা বলল, আর না, ঘরের দরজা খোলা।

জিত্ হাসছে।

চন্দ্রা আবার বলল, বিয়ে হবে, কিন্তু দেরি হবে।

জিত্ সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করল, কত দেরি?

—দু' বছর।

—দু' বছর! জিত্ বিমর্ষ, অবাকও।—এ যে হার্ট ফেল করার মতো লম্বা সময়!

চন্দ্রা হাসিমুখেই জবাব দিলো, হার্ট ফেল করতে লম্বা সময়ের দরকার হয় না।

—কিন্তু তা বলে দু' বছর কেন?

—ডি. পি. এম. করব।

—সেটা কি?

— ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল মেডিসিন। দু' বছরের কোর্স। একই সঙ্গে সাইকো অ্যানালিসিসের কোর্সও কমপ্লিট করব। যাক, এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি আমার দুটো কথার জবাব দাও দেখি।···তোমার তো কাস্টমস-এর চাকরি···সত্যি তুমি বিনে পয়সায় বিলিতি হুইস্কি এনে বাবাকে দিতে?

এই প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে জিত্ জবাব দিলো, বিনে পয়সায় নয়, চেষ্টা করলে সস্তায় পেতাম···উনি ভালবাসেন তাই দিতাম।

—তুমি এনে দিতে কি দিতে না এই নিয়ে মা কি তোমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

জিত্ নিরুত্তর।

—তার মানে জিজ্ঞেস করেছিল আর তুমি সেটা অস্বীকার করেছ। কিন্তু কেন?

—উনি ভুল বুঝতেন বা রাগ করতেন।

—কিন্তু মিথ্যে বলাতে কি ভুল কম বুঝেছে ? রাগ কম করেছে ? বাবা ভালবাসে যখন, তুমি না দিলে অন্য কোথাও থেকে বেশি দামে কিনে আনতই, এই সোজা সত্যি কথাটাই মাকে বলতে পারতে ?

জিত্ নিরুত্তর।

আবার কি মনে পড়ল চন্দ্রার। হাতের বই পাশে রেখে সোজা হয়ে বসল। বুকের কাছ থেকে চাদরটা খসে পড়ল।—আর একটা কথার জবাব দাও, বাবার ওপর ক্ষেপে গিয়ে মা তোমাকে চরিত্রহীন বলেছিল —নিজের চোখে কি দেখেছে বলছিল। কি দেখেছে ?

শুনে জিত্ হতভম্ব প্রথম। হঠাৎ ভেবেই পেল না এর কি জবাব দেবে। ও-রকম গালাগাল শুনে জিত্ নিজেও কম অবাক হতো না। মাথা নাড়তে গিয়েও আজ হঠাৎ মনে পড়ল কিছু। গলা দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এলো, ও…

—কি ? চন্দ্রা উৎসুক।

জিতের মুখে অস্বস্তির ছায়া। বলল, তুমি এভাবে জিজ্ঞেস করতে একটা ব্যাপার আমার মনে পডছে।…মদন বিশ্বাসের স্বভাব তো জানো, কফি হাউসে বসে কতগুলো মেয়ের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছিল, আমি সেই লায়লি নামে মেয়েটাকে আলাদা টেবিলে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করছিলাম, মদনের লাভ বার্ড ওই দলের মধ্যে আছে কিনা বা কোন্‌টি—

—তারপর ? চন্দ্রা আরো উৎসুক।

—সেই সময় তোমার মা ঢুকলেন।…এখন মনে পড়ছে কি রকম করে যেন আমার দিকে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর চলে গেলেন।

—কবেকার কথা এটা ?

—সব শেষ হবার দিন পনেরো কুড়ি আগে, জীবিত অবস্থায় আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।

চন্দ্রা সোজা জিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—আমাকে তো বল নি এ-কথা?

—বলার কি আছে, আমি তখন ভাবলাম ছেলেমেয়েদের হৈ-চৈ দেখে তিনি সরে গেলেন। তোমার সঙ্গে এতদিন মিশছি, তিনি যে আর কিছু

ভেবে বসতে পারেন জানব কি করে ?

—কিন্তু তুমি তো জানতে মায়ের কফির নেশা আছে, আর এও জানতে মায়ের ভিতরে ভিতরে একটা গোলমেলে ব্যাপার কিছু চলছে, আমি তোমাকে সে-আভাসও দিয়েছিলাম, তুমি তক্ষুনি উঠে এসে মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে না কেন ? সেটাই স্বাভাবিক হতো না ?

জিত্‌নারায়ণ অস্বীকার করতে পারল না। বিষণ্ণ মুখে বলল, হ্যা আমার ভুলই হয়েছে।

চন্দ্রা বলে উঠলো, ভুল—ভুল—মায়ের বেলায় আমাদের সকলেরই কেবল ভুলই হয়েছে, কিন্তু সেই ভুলের ফসল যে বিষম ভুলের দিকে গড়াতে পারে সে কথাই কেউ ভাবি নি।

জিত্‌ নির্বাক।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এবারে খুব স্বাভাবিক স্বরেই চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, মা চলে যাবার পর এই ক'মাস ধরে দেখছি তুমি কেমন ভয়-ভয় মুখ করে যাওয়া আসা কর। মা তোমার ওপর বিগড়েছিল বলে আমিও বিগড়েছি ভেবেছ ?

আমতা আমতা করে জিত্‌ বলল, তা না · হঠাৎ এমন একটা ওলট-পালট হয়ে গেল, আর তারপর থেকে তুমি এমন চুপ মেরে আছ, অস্বস্তি হবে না—তুমিই বলো ?···কিন্তু সত্যি তুমি এরপর আমাকে আরো দু' দুটো বছর অপেক্ষা করাবে ?

তার চোখে চোখ রেখে চন্দ্রা একটু হেসেই মাথা নাড়ল। তারপর বোঝানোর মতো করে বলল, আমি মায়ের একমাত্র মেয়ে, একটা বছর তো মহাগুরু দশার মধ্যেই কেটে যাবে।···তুমি এতদিন অপেক্ষা করেছ, এই দুটো বছরও দেখতে দেখতে কেটে যাবে! যে বিয়ে মা দেখে যেতে পারল না, তার জন্য আমারও একটু সময় দরকার জিত্‌। ওলট-পালট কিছু আমার মধ্যেও হয়েছে, কেবলই মনে হচ্ছে এরপর আমি কিছু পাব···মানে কিছু ধরতে ছুঁতে পাব, তার জন্য সময় দরকার। মায়ের এরকম মৃত্যু কক্ষনো একেবারে বৃথা যেতে পারে না, আমি খুব আশা করব জিত্‌। তুমিই আমার সব থেকে বেশি সহায় হবে। আমার দিকে চেয়ে হেসে

বলো হবে—হবে না ?

জিত্ চেষ্টা করে একটু হাসল। কিন্তু এ হাসির সঙ্গে যে মনের যোগ নেই চন্দ্রা সেটা বুঝেও আর কিছু বলল না।

কথা এরপর বাবার সঙ্গেও হয়েছে চন্দ্রার। সে তখন ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে মাকেই দেখছিল।

—চন্দ্রা!

কিন্তু ঘরে ঢুকে মেয়েকে মায়ের ফোটোর সামনে অমন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবা থমকে গেছে। চন্দ্রা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাবার দিকে চেয়ে মায়াই হচ্ছে তার। এই ক'দিনের মধ্যে যেন বুড়িয়ে গেছে কোমল স্বরেই জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবে বাবা ?

—ইয়ে…আমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, তুই এম. বি. বি. এস. পাশ করলি, ভাবলাম এবারে তোর বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হব…কিন্তু জিত্ বলছিল আবার নাকি ডি. পি. এম. করতে যাচ্ছিস তুই, দু' বছরের আগে বিয়ে হবে না ?

চন্দ্রা হাসিমুখেই বাবার কাছে এগিয়ে এলো।—তুমি একেবারে সেকেলে বাবার মতোই কথা বলছ বাবা, তুমি সাহায্য করলে তোমার শরীর ভালো রাখার ভার আমার। কিচ্ছু ভেবো না, দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আবার একটু দ্বিধার স্বরে বাবা বলল, জেনারেল প্র্যাকটিস ছেড়ে এ সব মেণ্টাল সাইডে মেয়েদের কি তেমন প্রসপেক্ট আছে…

চন্দ্রার ঠোঁটের ফাঁকে এখনো হাসি লেগে আছে একটু। বলল, তেমন প্রস-পেক্ট বলতে তুমি ভাবছ ভালো প্র্যাকটিস আর বেশি টাকা। তাই না ?

বাবা নিরুত্তর।

মোলায়েম করেই চন্দ্রা আবার বলল, তুমি তো এত বড় একটা মেডিক্যাল ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার বাবা, কত টাকা রোজগার করেছ, বাড়ি গাড়ি করেছ, কিন্তু জীবন যে-রকম হবে ভেবেছিলে তা কি হয়েছে ?

বাবার মুখে এবারও কোনো কথা নেই। বিষণ্ণ, বিমর্ষ।

চন্দ্রা আবার বলল, কিছু মনে কোরো না বাবা, তোমাকে আমি একটুও

ব্যথা দিতে চাই না।…তুমি মাকে চেনোনি আর মা-ও তোমাকে ভুল বুঝেছে, সামান্য থেকে মনের জট কোথায় গড়ায় এ তো নিজের চোখে দেখলে। ঘরে ঘরে এ-রকম কত সর্বনাশ যে হয়ে যাচ্ছে তুমি জানো না—এই জট ছাড়িয়ে মানুষকে সুস্থ জীবনের আলোয় ফিরিয়ে আনাটাই যেন আমার সাধনা হয়, তুমি আমাকে সেই আশীর্বাদ কর বাবা।

বাবা আর কিছু না বলে মুখ তুলে মায়ের ফোটোর দিকে তাকালো। চোখে জল এসে যাবার দাখিল। চন্দ্রার কাঁধে দুটো মৃদু চাপড় দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

চন্দ্রা আবার তার বই-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। এবারের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা আগের থেকেও ঢের বেশি। জিত্‌কে দেখেও চন্দ্রার একাগ্রতায় ছেদ পড়ে না। সহজ অথচ স্পষ্ট কথা তার।—আবার এখন এলে জ্বালাতে, এ চ্যাপটারটা শেষ হতে কম করে দু'ঘণ্টা এখন, বছরের পরীক্ষা এসে গেছে না? বেজার মুখ করে জিত্‌ বলে, আমিও তো একটা বছরের ধৈর্যের পরীক্ষায় পাস করতে চললাম, আমাকে তোমার কংগ্র্যাচুলেট করা উচিত।

—করলাম। হাসল।—এবার পালাও।

কিন্তু সঙ্গে জোসেফ মদন বিশ্বাস এসে হাজির হলে পড়াশোনায় জলাঞ্জলি তখনকার মতো। চন্দ্রার তন্ময়তার ফাঁকে দামী ক্যামেরা হাতে পা টিপে টিপে সামনে এসে দাঁড়াবে। তারপর ক্যামেরা ঠিক করে নিয়ে ভারী গলায় আচমকা বলবে, ইয়েস ম্যাডাম—

ঈষৎ চমকে চন্দ্রা মুখ তুলে হেসে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ঝল্‌সে উঠবে। পেশাদার ফটোগ্রাফারের কায়দায় অতিরিক্ত বিনয়ে মাথা নুইয়ে জোসেফ বলবে, থ্যাংক ইউ!

ছদ্ম কোপে চন্দ্রা বলে, দেখ, পরীক্ষার সময় জ্বালিও না বলছি—

টেবিলের খাতা বই-পত্র ছড়িয়ে একাকার করে দেয় মদন বিশ্বাস। গলায় গান লেগেই আছে। দুটো কারণে মেয়েমহলে মদন বিশ্বাসের কদর খুব। এক, ফোটো তোলা, দ্বিতীয়, গান। ফোটো তোলাটা নেশাও, পেশাও।

নিজের ছোট্ট ফোটো স্টুডিও করেছে একটা। আর গান যে সত্যি ভালো গায় তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। শুরু করলে কান পেতে শুনতে হয়। আর সময় বা পরিস্থিতি মাফিক গান তার গলার কাছে মজুত। তাছাড়া দরকার মতো গান বানাতেও পারে।

সেই গোছেরই কিছু গান হয়তো শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে চন্দ্রার বই-পত্র টেবিল থেকে তুলে নিয়ে লোফালুফি খেলা। সঙ্গে সঙ্গে সুর তরঙ্গের ওঠা নামা—

এই জীবনটাকে যাচাই ফাঁদে ফেলো না,
তাকে যেমন খুশি ছড়িয়ে দাও।
এই মন পাখিকে আশার খাঁচায় বেঁধো না।
তাকে আগল ভেঙে উড়িয়ে দাও।

গান শেষ হতে না হতে দু'হাত কোমরে, আর বিজয়ীর চাউনি জিতের মুখের ওপর।—কি দেখলি? কি বুঝলি?

জিতের গলায় খেদ আর ছদ্ম দীর্ঘনিশ্বাস দুইই মজুত।—যা দেখলাম তাই বুঝলাম। আমার থেকে তোর ওপরে ওর পক্ষপাতিত্ব ঢের বেশি।

চন্দ্রারও হালছাড়া খুশি মুখ।—কি করব, ও তো ঝড় একটা! তার পরেই মদনের দিকে ফিরে টিপ্পনী।—এত উদারতা কিসের, তোমার মনের পাখি কি খাঁচা ছেড়ে উড়েছে?

মদন বিশ্বাস গম্ভীর।—উড়ব উড়ব করছে।

—ও। এটি ক'নম্বর পাখি?

—বোধহয় পাঁচ নম্বর—পঁচিশও হতে পারে।

চন্দ্রা এরপর রাগ করবে না হাসবে?

লোকটা আচমকা এসে উদয় হয়, আবার হঠাৎ তেমনি চলেও যায়। সে-দিনও চলে যেতে চন্দ্রা পড়ার চিন্তা ভুলে জিজ্ঞেস করল, ওর আসল প্রেমিকাটি ঠিক কে হদিস পেয়েছ?

জোসেফ মদন বিশ্বাস যতই হালকা মেজাজে থাকুক আর যত রঙ্গ রস করুক, কোনো এক বিশেষ মেয়ে তার মন জুড়ে আছে এ কথা জিতের মুখেই চন্দ্রা ইতিমধ্যে অনেকবার শুনেছে। ছেলেবেলার বন্ধু। দুজনে এক

স্কুলে কলেজে পড়েছে, এক হস্টেলে থেকেছে। জিতের চাপাচাপির ফলেই মদন বিশ্বাস এক দিন নাকি স্বীকারও করেছে, বলেছে পাই না পাই, মনের আসন কখনও শূন্য পড়ে থাকে রে হাঁদারাম ?

অর্থাৎ পাক না পাক মদন বিশ্বাসের মনের আসন শূন্য নয়। সেই আসনের প্রেয়সীটি কে, এ নিয়ে অনেক সময় চন্দ্রা আর জিত্ গবেষণাও করেছে।

প্রশ্ন শুনে জিত্ সাগ্রহে মাথা নাড়ল —বোধহয় পেয়েছি, কিন্তু তোমাকে বলব কখন, দিন রাত তো বইয়ের মধ্যেই ডুবে আছ।

—কে ? চন্দ্রা সত্যিই উৎসুক।—আমি চিনি ?

—খুব চেনো। আমার মনে হয় বিদ্যা দীক্ষিত···ইদানীং ওই মেয়েটার সঙ্গেই বেশি মেলামেশা দেখছি।

শুনে চন্দ্রা অবাক। বলো কি! ওরা তো যেমন গোঁড়া তেমনি বড়লোক, ওখানে ভিড়তে গেল·· ক্রিশ্চিয়ান শুনলেই তো ওর বাবা তেড়ে আসবে!

—সেই জন্যেই হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলে না। জানে ঘা খেতে হবে···

চন্দ্রা বলল, মেয়েটা অবশ্য দেখতে বেশ, আর যেমন হাসি-খুশি তেমনি মিশুক। কিন্তু বিদ্যা তো নিজেদের ঘরের খবর রাখে, সে এগোয় কি করে ?

জিতের সাদামাটা জবাব।—এগিয়েছে তোমাকে কে বলল, সকলের সঙ্গে যেমন মিশছে ওর সঙ্গেও হয়তো তেমনিই মিশছে—তাছাড়া মেয়েরা তো এমনিতেই ওকে পছন্দ করে—ভিতরে ভিতরে বোধহয় এগিয়ে বসে আছে মদনই।

—বিদ্যা দীক্ষিত বুঝতেও পারে না বলছো--এ কখনো হয়!

—মদনের বেলায় হয়। সেই স্কুল কলেজ থেকে দেখে আসছি, বুঝতে না দিলে ওর ভেতর কেউ বুঝবে না, উত্তরে মুখ তো দক্ষিণে দেখে। আর অভিমানও তেমনি, পাবে না বুঝলে কখনো হাতও বাড়াবে না। ওর ফোটো স্টুডিওর পাওনা টাকা পর্যন্ত কত জনের কাছে পড়ে থাকে—নেহাৎ বাপ এককাঁড়ি টাকা রেখে গেছল সেই জোরে চলে যাচ্ছে।

জিতের মুখে বিদ্যা দীক্ষিতের নাম শুনেই ভিতরে একটা অস্বস্তি উঁকি-

ঝুঁকি দিয়েছে চন্দ্রার। ওই মেয়েকে চন্দ্রা খুব ভালো করে চেনে, ওর দু' ক্লাস নিচে পড়ত। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েটা ভালো নাচে, কোথাও ফাংশান হলে সেই বাচ্চা বয়েস থেকেই ওর ডাক পড়ে। ওই মেয়েকে নিয়ে একবার এক বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছিল। জিত্ ব্যাপার জানে কিনা চন্দ্রার জানা নেই। জানা থাকলে হয়তো তার বন্ধুকে সাবধান করে দিত।
···বিদ্যা দীক্ষিত সবে তখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে। ব্যাপারটা ওর কোনো বন্ধুর মুখ থেকেই সপল্লবে শুনেছিল চন্দ্রা। ঘটনাটা নিয়ে তখন বেশ কানাঘুষা হয়েছিল। এখানকার এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে কোন্ ফাংশানে ওর নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে তার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা। বিদ্যা তাকে কতটা পাত্তা দিত তা অবশ্য চন্দ্রা জানে না। হয়তো খুব একটা দিত না নইলে ও-ছেলে মরিয়া হয়ে শেষে ওকে অমন চিঠি লিখবে কেন? প্রথম দুটো চিঠি নাকি অনুনয় বিনয় করে লিখেছিল। সে দুটো নিছকই প্রেম-পত্র। সাড়া না পেয়ে ছেলেটার মেজাজ বিগড়েছিল লিখেছিল, বিদ্যাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এমন জীবন রাখা না রাখা সমান! কিন্তু তার আগে বিদ্যা যেন মনে রাখে ওর জীবনও খুব নির্বিঘ্ন হবে না—ওই ছেলে তা হতে দেবে না।
সেই সবক'টা চিঠি নিয়ে বিদ্যার বাবা ভালো হাতেই ওই ছেলেকে টিট করার জন্য এগিয়েছিল। পুলিশের এক খাতিরের অফিসারকে বলে ছেলেটাকে থানায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার প্রেমজ্বর পিটুনি খেয়ে ছেড়ে গেছল। কিন্তু বিদ্যার বাবা আদালত পর্যন্ত ছুটেছিল। ছেলের বাবা হাতে পায়ে ধরেও তাকে শান্ত করতে পারে নি। কোর্টে বিদ্যা বলেছে, অমন লোফার মার্কা ছেলের সঙ্গে খাতির দূরে থাক, তার মুখের আলাপও ছিল না।
যাক, লোকের অনুরোধ উপরোধে পড়ে বিদ্যার বাবা আর বেশি টানাহেঁচড়া করে নি। ছেলের বাপ ছেলেকে বাইরে কোথাও পড়তে পাঠিয়ে দেবে এই কড়ারে কেস তুলে নিয়েছিল। সেই ছেলে তারপর সত্যিই এ জায়গা ছেড়ে বরাবরকার মতো চলে গেছে।
···সে-সময় চন্দ্রা এই মেয়ের দোষ আছে কিনা ভাবে নি। এখনো জানে

না। কিন্তু জিতের মুখে জোসেফের সঙ্গে এই মেয়েরই মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার চলেছে আভাস পেয়ে ঘটনাটা মনে পড়ল। মুখে এখনো কিছু বলল না বটে, কিন্তু একটুও ভালো লাগল না।

এর কিছুদি:নর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার নিজের চোখে দেখে চন্দ্রারও মনে হলো জিতের ধারণাই ঠিক। ওই বিদ্যা দীক্ষিতই জোসেফ মদন বিশ্বাসের মুণ্ড ঘুরিয়েছে।

ক'টা দিন চন্দ্রা নিজের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল খুব। প্রথম বছরের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতে চন্দ্রা বেরিয়ে এসে দেখে তাদের গাড়িটার সামনে জিত্ দাঁড়িয়ে। বাবা সেদিন সকালের ট্রেনে কাছাকাছি কোথায় টুরে বেরিয়েছিল, রাত্রে ফেরার কথা। চন্দ্রা তাই বাবার সেকেলে ঢংয়ের বড় গাড়িখানা নিজেই ড্রাইভ করে চলে এসেছিল।

জিতকে দেখে চন্দ্রাও খুশি। কাছে এসে বলল, তোমার কথাই ভাবছিলাম, আজ ঠিক জানতাম তুমি আসবে।

জিত্ রসিকতা করে জবাব দিলো, তোমার ভাবা আর জানার টানেই তো এলাম। পরীক্ষা কেমন হলো ?

—ভালো।

জিত্ বড় নিশ্বাস ফেলল।—একটা দিন একটু খারাপ শুনলে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেতাম—বরাতে তাও হলো না—

চন্দ্রা হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলো। বলল, উঠবে তো ওঠো, আমি চললাম—

জিত্ তাড়াতাড়ি উঠে পাশে বসল। গাড়ি এগোতে জিজ্ঞেস করল, আজ আবার তোমার বই-পত্র নিয়ে বসার তাড়া নেই তো ?

সামনে চোখ রেখে চন্দ্রা বলল, না—কেন, কি ইচ্ছে ?

—আজ অন্তত এই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত যে-দিকে দু'চোখ যায়, দুজনে ভেসে পড়ি।

—এই গাড়িতে ?

—এটাই আমি অকূলে ভাসার ছোট্ট তরী ভেবে নেব।

মুখ না ফিরিয়ে চন্দ্রা হাসছে।—এই ঢাউস গাড়ি ছোট !

জিত্ প্রায় গম্ভীর।—আমার চোখে খুব ছোট, দুজনের বেশি ঠাঁই নেই। তবে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স হলো এ-তরীর হাল তুমি ধরে আছ।

ছদ্ম ঝাঁঝে চন্দ্রা বলল, তোমার মতো লোকের সঙ্গে ভাসতে হলে হাল আমি ছাড়া আর কে ধরবে? সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল, কাস্টমস্-এর চাকরিতে এই ভাব দেখে আমার ভাবনা হচ্ছে চাকরিতে না ডিমোশন হয়ে যায়।

গাড়ি বেশ স্পীডে চলছিল। আর দুজনেই হাসছিল। হঠাৎ পাশের পার্ক-টার দিকে নজর পড়তে চন্দ্রা ঘ্যাঁচ করে গাড়িটা থামিয়ে দিলো।

ছোটর ওপর সেই শৌখিন ভেনাস পার্ক। এটা বসন্ত কাল, ভেনাস পার্কের আরো রূপ খুলেছে। একটু দূরে দূরে পাথরের তকতকে বেঞ্চি পাতা। চারদিকে ছোট ছোট রং বাহার ফুলের গাছে রকমারি ফুল। গাল্চের মতো নরম সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে কেয়ারি করা ছোট ছোট ঝোপেও নতুন সবুজের ছোপ পড়েছে। পার্কের মাঝখানে পাথরে বাঁধানো বেষ্টনীর মধ্যে সুন্দর একটা ফোয়ারা—অবিরাম জলের খেলা চলে সেখানে। মনে হয় বিশাল একখানা জলের ছাতা মেলে ধরা হয়েছে। নানা রঙের লাইট ফিট করা সেখানে। রাতে ওই জল-ছাতার নানা রকম রং খোলে। ঝরনার সামনে ধপধপে সাদা পাথরের পূর্ণাঙ্গ ভেনাস মূর্তি। সুন্দরের প্রতীক। যৌবনের প্রতীক। এই ভেনাস পার্কও তাই।

সন্ধ্যায় ওই পার্ক জমজমাট। বয়েস কালের ছেলেমেয়েদের বাছাই করা গুঞ্জনক্ষেত্র ওটা। কিন্তু সন্ধ্যার এখনো ঢের দেরি। খটখটে দিনের আলো। সেখানে ভেনাসের মূর্তির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিত্তা দীক্ষিত। হাসছে। তার হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ফোটো তুলছে মদন বিশ্বাস। তার মাথায় পেল্লায় একটা শোলার টুপি। পরনে ঢোলা ট্রাউজারের ওপর ঢলঢলে রঙিন কোর্তা। ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে। ফোয়ারার সামনে আরো চার পাঁচ জন চেনা মেয়ে বসে হাসাহাসি করছে, আর বিত্তা দীক্ষিতের দিকে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে।

গাড়ি থামিয়ে চন্দ্রা দেখছে আর হাসি চাপছে। দেখেছে জিতও। গলা খাটো করে উৎফুল্ল মুখে বলল, দেখলে তো, কি বলেছিলাম?

চন্দ্রার ওই দিকেই চোখ, সামান্য মাথা নাড়ল। দু'ঢংএ দুটো ছবি তোলা হলো বিদ্যাদীক্ষিতের। মদন বিশ্বাস আবার আর এক রকম করে দাঁড়াবার মহড়া দিতে লাগল তাকে। এই পক্ষপাতিত্ব দেখেই হয়তো অন্য মেয়ে-গুলোর হাসি মুখে এবং স-কলরবে প্রতিবাদ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মদন বিশ্বাস ক্যামেরা হাতে আবার প্রস্তুত হতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিচ্ছিরি রকমের জোরে গাড়ির হর্নটা বাজিয়ে দিলো চন্দ্রা। এমনিতে সেকেলে গাড়ির কড়া হর্ন। শোনামাত্র পার্কের সকলেই সচকিত। ক্যামেরা হাতে মদন বিশ্বাস এদিকে ঘুরে তাকিয়েছে ওই মেয়েগুলোও।

এক গাল হেসে মাথা থেকে ঢাউস টুপি হাতে নিয়ে ক্যামেরাসুদ্ধ এদিকে ছুটল মদন বিশ্বাস। কিন্তু মাঝপথেই হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হলো তাকে। কারণ তাকে ছুটতে দেখেই তৎপর হাতে চন্দ্রা গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়েছে। ও মাঝামাঝি আসার আগেই একটা হাত তুলে টা-টা করে গাড়ি নিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল।

তারপর দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বোকা বনে গিয়ে মদন বিশ্বাস হাসছে। হাসছে পিছনের মেয়েগুলোও।

জিত্ বলল, বেচারা পড়ি-মরি করে ছুটে আসছিল আর তুমি তাকে এভাবে নাকাল করলে!

টিপ্পনীর সুরে চন্দ্রা জবাব দিলো, তুমিই তো বললে ছোট তরীতে দুজনার বেশি ঠাঁই হবে না।

জিত্ হেসে উঠলো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর গাড়ি নিয়ে মদন বিশ্বাসের ডেরায় এসে হাজির দুজনে। ডেরা বলতে পৈতৃক ছোট বাড়ি। স্টুডিও ঘরে আলো দেখে বুঝল বাড়িতে আছে। গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে দুজনে স্টুডিও ঘরের দিকে চলল।

দোরগোড়ায় এসে দেখে মদন বিশ্বাস ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে শুয়ে আছে। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। অ্যাশপটে অনেকগুলো আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে।

তার পাশেই টেবিলের ওপর একটা বড় ফোটো। দেখেই বোঝা যায় ওই ফোটোতে রঙের কাজ করা হয়েছে। এই কলাতেও পাকা হাত মদন বিশ্বাসের।

ছবি বিদ্যা দীক্ষিতের। ভেনাস পার্কে তোলা ছবি নয়। অন্য কোনো সময়ের তোলা হবে। মুখ থেকে বুকের তলা পর্যন্ত প্রমাণ সাইজের ফটো। ফোটোতে মুখ টিপে হাসছে বিদ্যা দীক্ষিত।

পিছন থেকে পা টিপে টিপে এসে খপ করে মদন বিশ্বাসের চুলের মুঠি ধরে নাড়িয়ে দিলো চন্দ্রা।—খুব যে, এত তন্ময় ?

মদন বিশ্বাস সোজা হয়ে বসে ওদের দেখল। সিগারেটে লম্বা টান দিলো একটা। সত্যি যেন বড় রকমের তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। আগের মতো আর উচ্ছল নয়। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি। চন্দ্রার দিক থেকে জিতের মুখের ওপর চোখ ফিরিয়ে বলল, তোদের সোহাগ-সফর শেষ হলো ?

জিত্ জবাব দিলো, ছোটো-খাটো রিহার্সাল হলো একটা, বিয়ের আগে সোহাগ-সফরে ও কি রাজি হবে।

চন্দ্রা মদন বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে চোখ পাকালো—ধরা পড়ে এখন কথা ঘোরানোর চেষ্টা! ছবি সামনে রেখে সোহাগ-সফরে এতক্ষণ কে উড়ে বেড়াচ্ছিল ? তলায় তলায় অনেকদূর এগিয়েছ তাহলে—অ্যা ?

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশপটে গুঁজল মদন বিশ্বাস। মুখ নয়, শুধু চোখ দুটো হাসছে যেন। জবাব দিলো, তা আমার দিক থেকে অনেক দূরই বলতে পারো।

—আর অন্য দিক থেকে ?

— অন্য দিকটি নিজের মুখ অচেনার পর্দায় ঢেকে রেখেছে। মদন বিশ্বাসের দু'চোখ এখনো হাসছে।

চন্দ্রা রেগেই গেল প্রায়। বলে উঠলো, সেই পর্দা তুমি ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে পারো না ? সে এগোয় কেন ?

মদন বিশ্বাস পল্‌কা জবাব দিলো, এগোয় না তো, নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকে।

—তবে আর কি, তোমার তাই দেখে মোক্ষলাভ একেবারে। চন্দ্রা আরও

তেতেউঠলো, মনের কথা খোলাখুলি বলে ফেলতে পারো না? কি করবে তোমার—মাথায় ডাণ্ডা বসাবে?

আয়েস করে আর একটা সিগারেট ধরালো মদন বিশ্বাস। জিত্ মিটিমিটি হাসছে আর ব্যাপারখানা উপভোগ করছে।

সিগারেটে গোটা দুই লম্বা টান দিয়ে জোসেফ চন্দ্রার দিকে চেয়ে রইল একটু। বলল, মনের কথা খোলাখুলি বলে ফেললে কি হবে জানো?

—কি হবে?

আস্ত সিগারেটটা আবার অ্যাশপটে গুঁজে মদন বিশ্বাস ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে বিত্তার রঙিন ছবিটা তুলে নিল। হাসি মাখা দু'চোখ ওটার ওপর বুলিয়ে নিল একবার। তারপর বোর্ডসুদ্ধু অত বড় ছবিটা ছিঁড়ে চার টুকরো করে মাটিতে ফেলল।

চন্দ্রা বিমূঢ় হঠাৎ। জিত্ও।

মদন বিশ্বাস বলল, মনের কথা খোলাখুলি বললে আমাব কল্পনার আনন্দ-টুকুও এমনি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

ছবির টুকরো পায়ে মাড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জোসেফ মদন বিশ্বাস।

ওরা দুজনে নির্বাক।

রাতে থেকে থেকে মদন বিশ্বাসের কথাই মনে হয়েছে চন্দ্রার বার বার। লোকটার অত হাসিখুশির দিকটাই সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। হঠাৎ-হঠাৎ এক-ধরনের বিষাদেও পেয়ে বসে। তখন তার টিকির দেখা মেলে না বড় একটা। বাড়ি তালাবন্ধ করে হঠাৎ হঠাৎ দিন কতকের জন্য নিখোঁজ হয়ে যায়। দু-এক মাসের জন্যেও হতে পারে। ভবঘুরের মতো পাহাড়ে জঙ্গলেও ঘুরে বেড়ায়। যখন আসে তখন আবার তর-তাজা ফুর্তির মানুষ। ওর ভিতরের এ-দিকটা মোটামুটি জানা আছে চন্দ্রার। কিন্তু এই দিনে যা দেখল সেটা এতদিনের দেখা বা জানার সঙ্গে ঠিক মেলে না। জিত্ বলছিল, মেয়েদের নিয়ে হৈ-চৈ ফুর্তি করে বেড়ায় আর ফোটো তোলে—কোনো মেয়েই এমন লোকের ওপর নির্ভর করে অন্তরঙ্গ জীবনে এগিয়ে

আসবে না—এই গোছের কিছু ভেবেই হয়তো মাঝেমাঝে এরকম হয়ে যায় ও।

কিন্তু চন্দ্রার তাও মনে হয় না। এমনিতে ডাক্তার, তার ওপর মানসিক চিকিৎসার জগতে ঢুকে গেছে। তার ধারণা, এই স্বভাবের মানুষের কাছে কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাছে এগিয়ে গেলেও সে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেবে না। যাকে নিয়ে কল্পনার জগৎ, সেই বিশেষ একজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে এই গোছের মন আপোস করবে না। এ এক ধরনের আত্মাভিমান, আত্মনিগড়। এর থেকে মদন বিশ্বাস সরাসরি ওই বিদ্যা দীক্ষিতের কাছে নিজেকে যদি প্রকাশ করে ফেলত আর জবাবে বিদ্যা দীক্ষিত যদি অকরুণ আঘাতে ওর কল্পনার জগতটাকে ভেঙেও দিত—মদন বিশ্বাসের পক্ষে তাও শুভ আর সুস্থ ব্যাপার হতো।

সকালেও ঘুরে ফিরে ওর কথাই মনে আসছিল চন্দ্রার। বই নাড়াচাড়া সার, মন বসছিল না।

ঘড়িতে তখন সকাল দশটা বেজে কয়েক মিনিট। খানিক আগে বাবা আপিসে বেরিয়ে গেল টের পেয়েছে। এবারে চানে ঢুকবে ভাবছিল চন্দ্রা। টেলিফোন বেজে উঠলো।

জিতের বাড়িতে টেলিফোন নেই। অফিসে পা দিয়ে সে-ই মাঝে মাঝে টেলিফোন করে থাকে। তাই ধরে নিয়ে চন্দ্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে সুস্থে টেলিফোন ধরল। কিন্তু সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিষম চমক। টেলি-ফোন জিতের নয়, হাসপাতাল থেকে কেউ করছে। চেনা হাসপাতাল, চন্দ্রা ওই হাসপাতালের হাউস স্টাফ ছিল।

ফোনের মধ্যে চন্দ্রা আর্তনাদই করে উঠলো প্রায়।—কখন? কতটা কেটেছে?

বুকের তলায় কাঁপুনি। শুনে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছে?

একটু যেন আশ্বস্ত। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে তবু। বলল, ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আসছি।

রিসিভার রেখে ব্যস্ত উতলা মুখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে দোরগোড়ায় লীলা

মাসি দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, কার অসুখ?

অসুখ নয়, সাংঘাতিক ব্যাপার। জোসেফ ব্লেড দিয়ে নিজের গলা কেটেছে, ওরা তো বলছে বেশি কাটতে পারে নি, চাকরটা চা দিতে এসে দেখে ও শুয়ে আছে আর বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার খানিক আগেই এই কাণ্ড করেছিল বোধহয়, তক্ষুনি চেঁচামেচি করে লোকজন ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে তাই রক্ষা। বলতে বলতে গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠছে চন্দ্রার।—শাড়িটা বদলে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, জোসেফই আমাকে খবর দিতে বলেছে—তুমি এক কাজ কর তো মাসি, জিত্‌কে আপিসে এক্ষুনি একটা ফোন করে দাও, যত তাড়াতাড়ি পারে হাসপাতালে চলে যেতে বোলো—

—বলছি। তোমার বাবা তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, তুমি যাবে কি করে?

ও…একটা টাঙ্গা ডেকে দিতে বল কাউকে চট করে!

চন্দ্রা ঘর থেকে এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেল।

হাসপাতাল।

দোতলার বড়-সড় ঘর একখানা। তিন কোণের তিন বেডে তিন রোগী চতুর্থ বেডে মদন বিশ্বাস। বেশ খোশ মেজাজে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে গলায় স্ট্র্যাপ আঁটা। চন্দ্রা যখন এই হাসপাতালের হাউস স্টাফ ছিল, তখন জিতের সঙ্গে মদন বিশ্বাসও হামেশাই আসত এখানে। তাই হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সদের অনেকেই চেনে ওকেও।

চন্দ্রা ঘরে ঢুকে দেখে, শুধু ডাক্তার আর নার্স দুজন কন্‌স্টেবল সহ একজন পুলিশ অফিসারও হাজির সেখানে। অফিসারটি খাতা খুলে বসেছে, জেরাও শুরু হয়েছে। চন্দ্রা এগিয়ে এসে দাঁড়াতে খুশি মুখখানা বেজার করে মদন বিশ্বাস বলে উঠলো, দেখ দেখি কি হুজ্জোৎ। এমন হবে জানলে কোন্ রাসকেল একাজ করত!

হাসার ব্যাপার নয়, হাসার মতো পরিবেশও নয়। তবু এ কথা শুনে এক চন্দ্রা ছাড়া সকলের ঠোঁটেই হাসি। পুলিশ অফিসার ঘাড় ফিরিয়ে চন্দ্রাকে ভালো করে দেখে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে মদন বিশ্বাস বলে উঠলো, এই রে, এবার বোধহয় ধরা পড়ে গেল।

পুলিশ অফিসার আবার ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কি ধরা পড়ে গেল ?

গলায় ব্লেড বসানোর কারণটা।

এবারে জোরেই হেসে উঠলো কেউ কেউ। পুলিশ অফিসার গম্ভীর।—দেখুন, এটা ঠাট্টা তামাসার ব্যাপার নয়—

ভুরু কুঁচকে চন্দ্রাকে দেখিয়ে মদন বিশ্বাস বলল, আপনিই বা ঘটা করে ওই মহিলার দিকে চেয়ে কি বুঝতে চেষ্টা করছিলেন ?

আবারও অনেকের মুখে চাপা হাসির তরঙ্গ। চন্দ্রার উতলা মুখে বিড়ম্বনার ছায়া। পিছন থেকে জিত্ এসে তার পাশে দাঁড়ালো। ভয়ে আর উত্তেজনায় সে ঘামছে।

সোজা হয়ে পুলিশ অফিসার এবারে বললে, আচ্ছা, আপনিই সত্যি করে বলুন তাহলে, কেন এ-কাজ করতে গেলেন ?

নির্লিপ্ত মুখ করে মদন বিশ্বাস জবাব দিলো, পর পর চার রাত ঘুম হয় নি, সকালে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে গিয়ে মনে হলো ব্লেডটার হয়তো ধার কমে গেছে। রেজারে ফিট করার আগে গলায় বসিয়ে দেখে নিতে গেলাম ধার আছে কিনা।

এবারে অনেকেই মুখে রুমাল চাপা দিলো। ওর কথা শুনে জিত্ হাঁ। হাসতে পারছে না শুধু চন্দ্রা।

পুলিশ অফিসার বলে উঠলো, গলায় ব্লেডের ধার পরীক্ষা করতে গেলেন ?

—তাইতো। মদন বিশ্বাসের তেমনি নির্লিপ্ত মুখ। —চার রাত না ঘুমোলে ও-রকম উদ্ভট খেয়াল অনেক সময় হয় মশাই, পর পর চার রাত না ঘুমিয়ে দেখেছেন কখনো ?

পুলিশ অফিসারের মুখ দেখে মনে হবে এমন উদ্ভট মানুষও সে কমই দেখেছে। উপস্থিত ডাক্তারদের দিকে ফিরল।—গলা কতটা কাটা হয়েছে, আই মীন্ হাউ ডীপ্ ?

একজন ডাক্তার চন্দ্রার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সকলের অলক্ষ্যে চন্দ্রা

কোমরের কাছে একটা আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি ইশারা করতে সেই ডাক্তারটিই আগ বাড়িয়ে জবাব দিলো, বেশি না, খুব সামান্যই কেটেছে। অফিসার মদন বিশ্বাসের দিকে ফিরল আবার।—ব্লেডের ধার পরীক্ষা করার পর কি করলেন?

—পরে দু' চোখ বড় করে ফেলল মদন বিশ্বাস।—ব্লেড গলায় ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে চোখে সর্ষে ফুল দেখলাম, আর যন্ত্রণায় হাঁউমাউ করতে করতে বি.ানায় আছড়ে পড়লাম।

সকলেব সঙ্গে এবারে পুলিশ অফিসারটিরও ঠোঁটে হাসিব আভাস। বলল, এবারে আব আমি তাহলে টানা হেঁচড়া করলাম না, কিন্তু ঘুম না হলে ভবিষ্যতে আর যেন গলার ওপর ব্লেডের ধার পরীক্ষা করতে যাবেন না। কৃতজ্ঞতায় দু' হাত জোড কবে ফেলে মদন বিশ্বাস বলে উঠলো আবার!

সদলে অফিসার চলে যেতে ঘরের জটলা হালকা হলো একটু। চন্দ্রা এধারে সরে এসে তার চেনা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি কতটা কেটেছে?

সে জানালো একেবারে মন্দ নয়, আর একটু ডীপ হলে ট্রেকিয়া টাচ হয়ে যেত—এখন ভয়ের কিছু নেই, গোটা তিনেক স্টিচ পড়েছে।

ভয়ের কিছু যে এখন আর নেই সেটা চন্দ্রাও বুঝতে পারে। কিন্তু ব্লেড আর সামান্য এগোলে কি হতে পারত তাও ডাক্তাবের কথা থেকে বোঝা গেল। চন্দ্রা পায়ে পায়ে বেডের কাছে এলো। থমথমে মুখ। চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল মদন বিশ্বাসের দিকে।

চেয়ে আছে মদন বিশ্বাসও। চোখে আর ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু দুষ্টু হাসি বলল, অমন করে তাকিও না ম্যাডাম, ব্লেডের থেকেও বেশি ধার মনে হচ্ছে, আর গলার বদলে বুকের ভিতরটা কাটছে।

পাশের নার্স হাসি চেপে প্রস্থান করল। চন্দ্রার অসম্ভব রাগ হচ্ছে। আবার এই লোকটার ওপরে যে এত মায়া তাও জানতে না। কিন্তু তা বলে এতটুকু প্রশ্রয়ও দেবার ইচ্ছে নেই ওকে। জিতের দিকে ফিরে বলল, চলো—মদন তখনো হাসছে।—বিকেলে আসছ?

চাপা ঝাঁঝে চন্দ্রা বলে উঠলো, কেন, আমার আসার কি দরকার ?

এবারে কিছুটা পরিতাপের সুর মদন বিশ্বাসের গলায়।—সত্যি রাগ কোরো না, আমি ভেবেচিন্তে কিছু করিনি, দাড়ি কামাতে গিয়ে হঠাৎ যেন মাথায় ভূত চাপল।

চন্দ্রা ঘর ছেড়ে চলে এলো। কতটা রাগ হয়েছে জোসেফকে সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতে চায়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জিত্‌ও এলো। চুপচাপ দুজনে নিচে নামল। রাস্তায় এসে চন্দ্রাই হাত তুলে একটা খালি টাঙ্গা থামালো। টাঙ্গা চলেছে। জিত আর চন্দ্রা পাশাপাশি বসে। চন্দ্রা নির্বাক গম্ভীর। জিত্‌ বলল, কি ব্যাপার বলো দেখি, আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না। কাল বিকেলেও তো ভেনাস পার্কে হৈ-চৈ করে ফোটো তুলছিল, রাতে দেখলাম অন্যরকম—এর মধ্যে কিছু হয়ে গেল নাকি ?

চন্দ্রা জবাব দিলো না। চুপচাপ সামনের দিকে চেয়ে আছে।

জিত্‌ আবার বলল, অথচ এখনই দেখ কেমন হাসি খুশি। আমাকেও বলছিল, হঠাং করে ফেলেছে, ভেবেচিন্তে করে নি···এ রকম খেয়ালও মাথায় চাপে কারো !

সামনের দিকে চোখ রেখেই চন্দ্রা জবাব দিলো, খেয়াল নয়, বড় রকমের কোনো ইমোশন্যাল ক্রাইসিস ছাড়া এ রকম হতে পারে না। ওই ব্যাপারের পর আপাতত সেটা পাস্‌ করে গেছে বলেই আজ ওকে সহজ স্বাভাবিক দেখছ।

জিত্‌ অবাক।—আপাতত মানে ? আবারও এ রকম কিছু করে বসতে পারে নাকি ?

চন্দ্রা জবাব দিলো, পারে কি না সেটা আর কেউ ছেড়ে ও নিজেও জানে না। আজ লজ্জা পাচ্ছে দেখলে না ? কিন্তু মেলাংকলিয়ায় পেয়ে বসলে সেটা এত চট করে যায় না।

কি মনে হতে জিতের দিকে ঘুরে তাকালো চন্দ্রা।—তুমি বিদ্যা দীক্ষিতের বাড়ি চেনো ?

জিত্‌ অবাক একটু।—চিনি, এখন সেখানে যেতে হবে নাকি ?

মুখে একটা কঠিন ছায়া পড়ল চন্দ্রার। জবাব দিলো, তুমি না, আমি

যাব। তুমি গাড়িতে বসবে।

মিনিট দশকের মধ্যে টাঙ্গা দীক্ষিত হাউসের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। কম্পাউণ্ডের মধ্যে মস্ত বাড়ি। দুদিকে বাগান। ফোয়ারা। মাঝখানের রাস্তা বাড়ির সিঁড়িতে গিয়ে থেমেছে।

চন্দ্রা টাঙ্গা থেকে নামতে অনুনয়ের সুরে জিত্ বলল, রাগ-টাগ কোরো না যেন, কি বলে দেবে তার ঠিক নেই—

গম্ভীর দু' চোখ তুলে চন্দ্রা শুধু তাকালো একবার তারপর ভিতরে ঢুকে বাড়ির দিকে চলল। কেউ কিছু বলে দেবে এ চিন্তা চন্দ্রার নেই। নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর অটুট আস্থা তার।

না যেন, কি বলে দেবে তার ঠিক নেই—

গম্ভীর দু' চোখ তুলে চন্দ্রা শুধু তাকালো একবার তারপর ভিতরে ঢুকে বাড়ির দিকে চলল। কেউ কিছু বলে দেবে এ চিন্তা চন্দ্রার নেই। নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর অটুট আস্থা তার।

সিঁড়ির কাছাকাছি হতে কোণের দিকের একটা ঘর থেকে গান-বাজনার শব্দ কানে এলো। শুধু গান-বাজনা নয় ক'টা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা ধরে সেদিকে এগোতে গানের তালে তালে নাচও চলছে বোঝা গেল। পায়ে পায়ে চন্দ্রা সেই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। উঁকি দিয়ে দেখল, বাজনা-সহ হালকা চালের রেকর্ড বাজছে একটা, আর তার সঙ্গে নাচের মহড়া দিচ্ছে বিত্তা দীক্ষিত। পরনে সিল্কের ঝকঝকে ঘাগরা, পায়ে নূপুর। পাশের চেয়ারে বসে যে রমণীটি মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ বার করে মহড়া নিচ্ছে সে সম্ভবত নাচের শিক্ষয়িত্রী।

বিত্তা দীক্ষিত শুধু দেখতে সুন্দর নয়, নাচেও বেশ। বিঘ্ন না ঘটিয়ে চন্দ্রা চুপ-চাপ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিতরটা অকরুণ।

নাচ গান শেষ হতে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিত্তা দীক্ষিত দরজার বাইরে পা দিতেই বিস্ময়ে হাবুডুবু মুখ। নাচের পরিশ্রমে অল্প অল্প ঘামছে।—

চন্দ্রাদি, তুমি এখানে! কি আশ্চর্য, কখন এলে?

চন্দ্রার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস।—বেশিক্ষণ নয়, ডিসটার্ব

না করে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম।

অপ্রত্যাশিত কাউকে দেখে খুশি হবার মতোই মুখ বিদ্যার। শিক্ষয়িত্রীকে বিদায় দিয়ে হাত ধরে চন্দ্রাকে ঘরে নিয়ে গেল।—তুমি আসবে আমি ভাবতেই পারি নি, বোসো বোসো—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলে বুঝি?

হ্যাঁ...। গান-বাজনা নাচের সরঞ্জাম বিছানো ঘরটা দেখে নিল একবার। দেয়ালে নানা জনের নানা ঢংয়ের নাচের ছবি।—তোমাদের তো খুব গোঁড়া পরিবার শুনেছিলাম...এখন পর্যন্ত তাহলে নাচে বাধা পড়ে নি?

হাসিমুখে বিদ্যা জবাব দিলো, বাধা পড়বে কেন, সে-দিন কি আর আছে নাকি! আমি সব গোঁড়ামি ভেঙে দিয়েছি—

চন্দ্রা বলল, ভালো...কিন্তু কদ্দূর ভাঙতে পারবে?

তেমনি হালকা হেসেই বিদ্যা জবাব দিলো, দরকার হলে অনেক দূর পর্যন্ত পারব! বোসো না, কি খাবে বলো।

—বসবও না, খাবও না। তোমার সঙ্গে এমনি দুটো কথা বলতে এলাম। কাল ভেনাস গার্ডেনে কেমন ছবি তোলা হলো?

হেসে বিদ্যা জবাব দিলো, ভালো, তুমি তোমাদের ওই গাড়িতে হুট করে এসেই চলে গেলে—তারপর আর তেমন জমল না। জোসেফ আর কারো ফোটোই তুলল না, বলল মুড নেই।

চন্দ্রা এটা আশা করে নি! চকিতে ভেবে নিল একটু। ওদের আনন্দ করে বেড়াতে দেখে বিদ্যা দীক্ষিত যে কত নাগালের বাইরে সেটা আরও বেশি মনে হয়েছে হয়তো। জিজ্ঞেস করল, জোসেফ মদন বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার কত দিনের আলাপ বলো তো?

—তা প্রায় দু'বছর হবে, কফি হাউসে এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ....ভারী মজার মানুষ, ভালো গান গায় আবার চমৎকার ফোটো তোলে। আমার বাবা মায়েরও সুন্দর ফোটো তুলে দিয়েছে।

চন্দ্রার মুখে কোনো ভাবের লেশ নেই, শুধু চাউনিটা ওর মুখের ওপর স্থির। বলল, ওর বাড়িতে একটা ফোটো স্টুডিও আছে, দেখেছ?

—দেখব না কেন, এরই মধ্যে দু'দিন গেছি তো। আমারই একটা বড় ফোটোতে সুন্দর রঙের কাজ করছে—ওটার জন্য অনেক টাকা দেবো

বলে কালও তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য তাগিদ দিয়েছি।

চন্দ্রার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠলো।—অনেক টাকা দেবে বলেছ? তোমাদের অনেক টাকা—টাকা দিলেই সব কিছুর দাম শোধ হয়ে যায় —কেমন?

চন্দ্রা বলল, বা রে, বন্ধুত্ব হয়েছে বলে দাম দেবো না কেন! এ তো ওর পেশা—

—হ্যাঁ, এমন পেশা যে কাল রাতে তোমার ওই ছবি আমার সামনে চার টুকরো করে ছিঁড়েছে—বুঝলে?

বিদ্যা সত্যি অবাক।—সে কি! কেন? রঙের কাজে কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, রঙেই গণ্ডগোল হয়েছে। আর সেই যন্ত্রনায় আজ সকালে ব্লেড দিয়ে সে নিজের গলা কাট্‌তে গেছল, মন্দ জখম হয় নি, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে, আমি তাকে দেখে হাসপাতাল থেকে আসছি।

বিদ্যা বিষম আঁতকে উঠলো।—কি সর্বনাশ! ব্লেড দিয়ে গলা কাটতে গেছে! পাগল নাকি লোকটা! এ কি বলছ তুমি চন্দ্রাদি?

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় চন্দ্রা জবাব দিলো। ঠিকই বলছি। পারো তো গিয়ে দেখে এসো, আর এখন তুমি কি দাম দিতে পারো মাথা খাটিয়ে ভেবো একটু। আচ্ছা চলি—

আর একটুও অপেক্ষা না করে চন্দ্রা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। রাস্তা ধরে ফটকের দিকে।

বিদ্যা দীক্ষিত হতভম্ব, বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে।

টাঙ্গায় ফিরে এলো। জিত্‌ আর চন্দ্রা পাশাপাশি বসে। জিত্‌ আশা করছিল চন্দ্রা নিজে থেকে কিছু বলবে। বলল না। টাঙ্গা ছুটেছে। কারও মুখে কথা নেই। চন্দ্রা রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

পরদিন হাসপাতালে জোসেফকে দেখতে এসেই চন্দ্রা বুঝল বিদ্যা দীক্ষিত এসেছিল। ও সামনে দাঁড়াতেই জোসেফ তড়বড় করে বলল, বড়ই কোমল প্রাণ তোমার ম্যাডাম, আমার জন্যে তুমি যাকে বলে একেবারে ম্যাজিক দেখিয়ে ছেড়েছ—ও মেয়ে যেভাবে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখছিল

যেন পাগলা গারদে না গিয়ে আমি এখানে ঠাঁই পেলাম কি করে ভেবে পাচ্ছিল না। বসতে বলতে চেয়ারটা তিন হাত দূরে টেনে নিয়েবসল। চন্দ্রা উৎসুক একটু। তবু ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, কি বলল?

—বলবে আবার কি, তোমার কথায় ঘাবড়ে গিয়ে শুধু দেখতেই এসেছিল। কিন্তু ম্যাডাম, তুমি এত বুদ্ধি রাখো, এটুকু জানো না ঘষে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে প্রেম কোনোটাই টেঁকে না?

চন্দ্রা জবাব দিতে যাচ্ছিল, আমার বেলায় তো ধরে বেঁধে প্রেম দিব্যি টিঁকিয়ে ছেড়েছ। বলল না। কোনো পল্‌কা কথা বলার মেজাজ নয় এখন। চাপা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলো, অত জেনেও তাহলে ভিড়তে গেছলে কেন? বিভা কি বলল শুনি?

জোসেফ হাসছে মিটিমিটি।—ওর অমন সুন্দর ছবিটা ছিঁড়ে ফেললাম কেন।...তুমি বোধহয় বলেছ রঙের গণ্ডগোল হয়েছে, তাই বকল, সেই দুঃখে গলায় ব্লেড বসাতে হবে! তারপর আশ্বাস ছিল, যা হয়েছে হয়েছে—আবার করলে ডবল দাম দেবে।

—এই সুযোগে কি দাম চাও সেটা ওকে বুঝিয়ে দিলে না কেন?

জোসেফ মুখের দিকে চেয়ে আছে। নিঃশব্দে হাসছে। সত্যি সুন্দর হাসতে পারে। বলল, আমার জন্য তোমার এত মায়া দেখে কি আনন্দ যে হচ্ছে ম্যাডাম...আমার চালচুলো নেই, অমন দাম চাইলেই সে দেবে কেন! তার থেকে এক কাজ করা যাক, জিত্‌ অল ইণ্ডিয়া কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করা ছেলে—ও এগোলে বিভা দীক্ষিত সেটা খুব ফেলনা ভাববে না হয়তো...তোমার যখন এত মায়া আমি তোমাকে নিয়েই সটকে পড়ি। এই গোছের বাচালতা মুখের ওপর কেবল জোসেফই করতে পারে। চেষ্টা করেও চন্দ্রা আর গম্ভীর থাকতে পারল না।

২

পাহাড়ী পথে এঁকেবেঁকে টাঙ্গা চলেছে। চন্দ্রা নারায়ণ নিশ্চল বসে। পাশে প্রোফেসার মহেশ্বর যাদবের দেওয়া ফুলের গোছা। দুদিকে ঝকঝকে নীল আকাশ। পাহাড় আর জঙ্গলের মাথায় ঝলমলে রোদ। চন্দ্রা নারায়ণ কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, কিছু দেখছে না। শুধু স্থাণুর মতো বসে আছে।

সামনের বাঁকের মাথায় আচমকা একটা গাড়ি আসতে টাঙ্গার চালক সজোরে রাশ টানল। মুখোমুখি একটা সংঘাত ঘটে যেতে পারত। ও-ভাবে বাধা পেয়ে ঘোড়াটা সামনের দু'পা উঁচিয়ে থেমে গেল আর সেই সঙ্গে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বড় ডাক ছাড়ল।

গাড়িটা পাশ কাটিয়ে যেতে আবার টাঙ্গা চলল। কিন্তু ঘোড়ার ওই ডাক শোনার পরেই চন্দ্রার মাথার মধ্যে আবার যেন রিন রিন শব্দটা বেজে উঠল। বেজে চলল। শব্দটা বাড়ছেই। মাথার ভেতরটা ভরাট করে দিচ্ছে। চোখের সামনে থেকে রাস্তা পাহাড় জঙ্গল নীল আকাশ আবার সরে যাচ্ছে।

ঘোড়ার মতো চিঁহি-চিঁহি ডাক ছেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ছবির মতো ছোট বাংলোর বারান্দায় ঘোড়া হওয়া একটা মানুষ। মদন বিশ্বাস। সেই মানুষ-ঘোড়ার ওপর চেপে বসেছে আট বছরের ছেলে বাচ্চু। ঘোড়া-কাকার পিঠে চেপে সমস্ত বারান্দায় চক্কর খাচ্ছে সে। ঘোড়া-কাকা থামলেই জুতোসুদ্ধ ছোট দুটো পা দিয়ে দু'দিকের পাঁজরে ঠোক্কর লাগাচ্ছে আর উপুড় হওয়া ঘোড়াও তাইতে সরবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ছেলেটার খুব মজা, সে হেসে সারা।

অদূরে সোফায় বসে একটা বই পড়ছে জিত্ নারায়ণ।

এই সুন্দর বাংলোটা চন্দ্রার টাকায় হলেও দু'জনের নামে করা হয়েছে।

প্রায় দশ বছর হতে চলল দেশ ছেড়ে ডক্টর চন্দ্রানারায়ণ এই মহানগরের একমাত্র মানসিক হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। এখন সে হাসপাতালের সর্বে-সবাদের একজন। ডি. পি. এম. করার তিন মাসের মধ্যে এখানে চাকরি তার আগেই বিয়ে হয়ে গেছল। অগত্যা তদবির তদারক করে জিত্‌কেও এখানে বদলি হয়ে আসতে হয়েছে। তার ছ'মাসের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকে চন্দ্রার বাবা মারা গেল। চন্দ্রার আর পিছুটান বলতে কিছু থাকল না। মোটা টাকায় বাড়ি বেচে দিয়ে নিজের পছন্দমতো এই বাংলো তৈরী করালো। তারপর থেকে এখানেই। হাসপাতালের মোটা মাইনেও কিছুই নয়, এখন এমনি জম-জমাট প্র্যাকটিস। ঘরের কাজ লীলা মাসী দেখে।

চন্দ্রার ছোট চকচকে বেবি অস্টিনটা বাংলোর সিঁড়ির গোড়ায় থামল ঘোড়া তখন সোয়ার সহ চাঁদোয়া বারান্দার অন্য দিকে। তারা খেয়াল করল না বা লক্ষ্য করল না। জিত্‌ নারায়ণ মুখ তুলে একবার দেখল শুধু, তারপর আবার পড়ায় মন দিলো।

চন্দ্রা আগেও ড্রাইভ করত, এই নিজের গাড়িও নিজেই ড্রাইভ করে। গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় পা দিয়েই চক্ষু স্থির তার। সোয়ার সহ ঘোড়া তখন এদিকে ঘুরে এসেছে। দুই পাঁজরে বেশ জোরে জোরে ঠোক্কর পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঁহি চিঁহি রব—আর ছেলের ততো হাসি।

চন্দ্রা ছুটে গিয়ে বাচ্চুকে ধরল দু'হাতে, তারপর রাগের চোটে বড়সড় কয়েকটা ঝাঁকানি।—পাজী ছেলে, এভাবে জুতো দিয়ে পাঁজরে মারছিস, ওর লাগে না? নাম্‌ বলছি, শিগগীর নাম্‌!

গোমড়া মুখ করে বাচ্চু মানুষ-ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ঘর্মাক্ত হাসিমুখে মদন বিশ্বাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়তে লাগল। মায়ের জন্য এমন আনন্দটাই মাটি। রাগত মুখে বাচ্চু বলল, আমি তো ঘোড়াকে মারছিলাম।

চন্দ্রা আরো তেতে জবাব দিলো, ঘোড়াকে মারছিলি? তুই ঘোড়া হ' দেখি, আমি মেরে দেখি তোর লাগে কি না? একই সঙ্গে মদন বিশ্বাসকেও ধমকে উঠলো, হাসছ কি, তোমাকেও ধরে দু' ঘা দিতে ইচ্ছে করছে আমার! পাশে সোফার মানুষটার দিকে চোখ গেল। এবারে আরো একটু জোরেই

চন্দ্রা বলে উঠলো, তুমিই বা কি, সামনে এই কাণ্ড হচ্ছে আর তুমি বই-ই পড়ে যাচ্ছ!

জিত্ নারায়ণ বই সরালো। নির্লিপ্ত মুখ।—কি হয়েছে?

—ওই পাজী ছেলে জোসেফের বুকে পাঁজরে কি রকম জুতোর ঠোক্কর মারছিল, দেখেছ?

—দেখেছি। ঘোড়া রোগে গেলে আমি কি করব। আবার পড়ায় মনোযোগ।

উক্তিটা মদন বিশ্বাসের উদ্দেশে। চন্দ্রার দিকে চেয়ে মদন বিশ্বাস সিরিয়াস মুখভঙ্গী করল একটু। বলল, এই চার মাসের মধ্যে ভায়ার মেজাজের আরো কিছু উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে?

চন্দ্রা বলল, আরো কিছু? কত উন্নতি হয়েছে জানো না, এই হারে মেজাজের উন্নতি হতে থাকলে শীগগীরই তোমার বন্ধুকে আমার ওই অ্যানালিসিস চেম্বারে নিয়ে ঢোকাতে হবে। আঙুলে করে কোণের ঘরটা দেখিয়ে দিলো।

—আ-হা-হা, ত্বরা করো, ত্বরা করো ম্যাডাম, এই আশাতেই ওর মেজাজের এমন চচ্চড়িয়ে উন্নতি!

চন্দ্রা হাসতে গিয়েও পাশে তাকালো। না, ছেলে এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে গেছে। ভ্রূকুটি করে বইয়ের আড়ালে ঘরের লোকের গোমড়া মুখখানা দেখল একবার। তারপরেই মদন বিশ্বাসের দিকে ঘুরে চোখ পাকালো।—তা তোমার খবর কি, ফের এই চার মাস কোথায় ডুব মেরে ছিলে?

ঘটা করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে মদন বিশ্বাস জবাব দিলো, ইন সার্চ অফ এ সুইট হার্ট ম্যাডাম, একটি সহৃদয়া সখী সন্ধানে।

—এখানে বাড়ি করেও তো বছরের মধ্যে চারবার করে সখী সন্ধানে হাওয়া হয়ে যাচ্ছ—সখী আর জুটবে কবে?

—জুটবে না। যাকে দেখি মনে হয় এগোতে গেলেই আবার সেই থাপ্পড় খেয়ে ফিরতে হবে। সেই সৎ সাহস না দেখিয়ে সদর্পে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসি।

চন্দ্রা হাসিমুখেই বলল, এরপর আমার কাছেও থাপ্পড় খেতে হবে—

যেন জল তেষ্টা পেয়েছে এমনি একটা শব্দ বার করল মদন বিশ্বাস গলা দিয়ে।—হ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি সুইট মাই ডিয়ার—

হঠাৎ গম্ভীর। সোফার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর চটাস করে এক সত্যি-কারের থাপ্পড়ে জিত্ নারায়ণের হাতের বই ছিটকে দশ হাত দূরে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে তাকালো তার দিকে।

জিত্ সত্যিই বিরক্ত।—কি করিস, বইটা ছিঁড়বে না?

—ছিঁড়ুক। দশ বছর হয়ে গেল, ওই হাতের থাপ্পড় খেয়ে দেখেছিস?

চন্দ্রার মুখে চাপা হাসি। জিত্ বলল, ও-রকম থাপ্পড় হাসব্যাণ্ডদের বরাতে জোটে না, পেসেন্ট বা অন্য কেউ হলে কথা ছিল।

—অন্য কেউ মানে?

—যেমন তুই।

মদন বিশ্বাস ধুপ করে তার পাশেই বসে পড়ল।—আ-হা! সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে উঠলো, সখা-রে, আবার বল্ —আমার কান জুড়াইল প্রাণ জুড়াইল, সখা তুই রাধার কথা আবার বল্।

গানের গলা কানে যেতেই বাচ্চু ভেতর থেকে ছুটে এলো। চন্দ্রা হাসতে গিয়েও গম্ভীর।—এই! সকাল থেকে বাঁদরামো করে বেড়াচ্ছিস, তোর স্কুলের পড়া সব হয়ে গেছে?

বিপাকে পড়ে বাচ্চু বাবার ঘাড়ে দোষটা চাপাতে চেষ্টা করল।—বাবা তো পড়ালো না···

চন্দ্রার বিরক্তিমাখা দৃষ্টিটা একবার জিতের মুখের ওপর ঘুরে এলো। তারপর ধমকের সুরে চন্দ্রা ছেলেকে বলল, বই নিয়ে বোসোগে, আমি আসছি—

মায়ের হুকুম অমান্য করার উপায় নেই, বিরস মুখে ছেলের প্রস্থান। এবারে রাগত সুরেই জিত্‌কে বলল, সকালে বাড়িতে থাকো, ছেলেটাকে বই নিয়ে একটু বসাতেও পারো না?

মদন বিশ্বাসের দিকে চেয়ে জিত্ বলল, সকালে বাড়িতে থাকাটাও অপরাধ —বুঝলি?

চন্দ্রা ঝাঁঝালো সুরে বলল, না সমস্ত অপরাধ আমার। নিজে না পারো

তো একজন টিউটর রেখে দিচ্ছি—তখন তো বড় বড় কথা, টিউটরের হাতে ছেলে মানুষ হয় না।

মদন বিশ্বাস বেশ মজা পাচ্ছে। হাসছে মিটিমিটি। নিজের ঘড়ির দিকে চোখ যেতে জিগ্যেস করল, সাড়ে ন'টা বাজে, তোর আপিস নেই আজ?

মুখ বিকৃত করে জিত্ আড়ামোড়া ভাঙল একটু।—গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে, আজ আর যাব না।

সামনের টেবিলের আধ-বসা হয়ে চন্দ্রা টিপ্পনী কাটল, সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন করে গা ম্যাজমেজের জন্য আপিস কামাই আজকাল, চাকরি থাকে কি করে বুঝি না।

এবারে মদন বিশ্বাস জিতের কাধে জোরেই একটা চাপড় বসাল।—ঘরে এমন একটা রোজগেরে মেশিন থাকতে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন কামাই! তুই একটা ইডিয়েট। তা ব্যাপারখানা কি—যত্ন-আত্তির অভাব হচ্ছে?

জিত্ ব্যঙ্গ করে জবাব দিলো, না, খুব সুখে আছি।

চন্দ্রা ফোঁস করে উঠলে., লজ্জা করে না বলতে, খুব অ-সুখে রেখেছি তোমাকে?

সমর্থনের আশায় এবারে জিত্ মদন বিশ্বাসেরই শরণাপন্ন যেন।—তাহলে সুখ কেমন শোন্। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে হাসপাতাল, তখন হয়তো আমি ভালো করে ঘুম থেকেই উঠি নি, হাসপাতালের রাউণ্ড সেরে বাড়ি ফিরতে বেলা দশটা, তোর ভাগ্যে আজ সাড়ে নটার আগে দেখছিস—যাক, তখন আমি আপিসে। বেলা তিনটে থেকে ওই ঘরের সামনে রোগী আর রোগিনীর ভিড়—একে একে অ্যানালিসিস চলবে—

—এক মিনিট, আজকাল রোগীর ভিড় বেশি না রোগিনীর? ইচ্ছে করেই মদন বিশ্বাস চন্দ্রার দিকে তাকাচ্ছে না।

জিত্ জবাব দিলো, রোগীর তো বটেই, বেশির ভাগের বয়স তোর আমার থেকে কম—তারা মোস্ট্লি অ্যানালিসিসের পেশেণ্ট—দরজা বন্ধ করে এক ঘণ্টা করে যাদের সীটিং অ্যানালিসিস দরকার, তার আগে অন্য পেশেণ্ট তো চট্পট বিদায়। চন্দ্রা একটুও রাগ করছে না, তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টিপটিপ করছে।

—বলে যা। মদন সিরিয়াস মুখ করে নালিশ শুনছে।

—বিকেল ছ'টা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ওই রকম চলল। তারপর বাইরে কল সেরে ফিরতে এক-একদিন রাত দশটা এগারোটাও হতে পারে—কল কম থাকলে প্রোফেসার যাদবের বাড়ি বাড়তি জ্ঞান লাভের জন্য ছুটতে হয়—সে বেচারা তো আবার ব্যাচেলার, এমন ছাত্রীকে জ্ঞান দেবার ব্যাপারে তারই বা উৎসাহ কম হবে কি করে—মোট কথা ও বাড়ি ফেরে যখন বেশির ভাগ দিনই আমি আর ছেলে ঘুমিয়ে পড়ি।

চন্দ্রার মুখে এখনো রাগের চিহ্নমাত্র নেই হাসছে। বলল, কাস্টমস-এর চাকরি তো—বাড়িয়ে না দেখে বা বাড়িয়ে না বলে পাবো না।

—ওয়েট! ধমকের সুরে মদন বিশ্বাস বলল, তোমার নিজের পক্ষে কিছু বলার থাকে তো বলো।

—তোমাকে বলতে বয়ে গেছে।

মদন বিশ্বাস শুধু গম্ভীর নয়, যাকে বলে গুরুগম্ভীর।—এই যদি তোমার রুটিন হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে জিত্ যে-রকম যত্ন আত্তি আশা করে তোমার কাছ থেকে সে-রকম পায় না, সো ইন মাই ওপিনিয়ন ইউ আর গিল্টি!

হ্যাণ্ডস আপ!

বাচ্চুর আচমকা দাবড়ানির স্বরে সকলে সচকিত। দরজার কাছ থেকে মায়ের দিকে একটা রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি সর্বনাশ। এক লাফে সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে চোখের পলকে মদন বিশ্বাস ওটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল।—এটা তুই পেলি কোথায়, আমার কোটের পকেটে হাত দিয়েছিলি?

এদিকে চন্দ্রা আর জিতও বিমূঢ়। বেগতিক দেখে বাচ্চু বলল, আমার জন্য চকোলেট এনেছ কিনা দেখতে গিয়ে এটা পেলাম তো!

শঙ্কিত গলায় চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, সত্যিকারের রিভলভার নাকি?

মদন বিশ্বাস জবাব দিলো, পর পর তিন গুলিতে তিনজনকে যমালয়ে পাঠানোর মতো সত্যিকারের—কি সাংঘাতিক ছেলে রে তুই, ভাগ্যিস লক করা ছিল!

চন্দ্রা উতলা তবু।—এ সব জিনিস তোমার পকেটে থাকে কেন? তুমি রিভলভার কোত্থেকে পেলে?

—বা রে, এটা তো বাবার আমলের—ফরেস্ট অফিসারদের সকলের কাছেই থাকত। বাবা মারা যেতে নিজের নামে লাইসেন্স করিয়ে নিয়েছিলাম, যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যাই, তখন সঙ্গে রাখতে হয়। এই গেলবারেই তো দানাপুরের কাছাকাছি ট্রেনে তিন তিনটে গুণ্ডার হাত থেকে এটার জোরে বেঁচে ফিরেছিলাম—তোমাদের বলেছিলাম, ভুলে গেছ?

বলেছিল বটে। মনে পড়া সত্ত্বেও চোখের সামনে ওই জিনিসটা দেখে চন্দ্রা অস্বস্তি বোধ করছে।—ওটা আর কোটের পকেটে ফেলে না রেখে সাবধানে কোথাও রেখে এসো।

—আর রেখে কাজ নেই, কোট চড়িয়ে আমি এক্ষুনি হাওয়া হচ্ছি।

—সে কি! খেয়ে যাবে না?

জবাব না দিয়ে মদন বিশ্বাস ঘরে ঢুকে গেল। কোট গায়ে চড়াতে চড়াতে তক্ষুনি বেরিয়ে এলো। বলল, আজ নো খাওয়া নট্ কিচ্ছু। ভিখু শ্রীমান এই চার মাসে আমার ঘর আর স্টুডিওর যে হাল করে রেখেছে যদি দেখতে। কালকের আগে আর ফুরসৎ পাব না, জঙ্গল থেকে এবারে অনেকগুলো দারুণ ছবি তুলে এনেছি, সেগুলো নিয়েও বসতে হবে। বাট ইউ হ্যাভ বিন ফাউণ্ড গিল্টি—তোমার ছাড় নেই। কাল বিকেল ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত তোমার সময় জরিমানা করা হলো, তোমাকে নিয়ে তোমারই গাড়িতে আমরা সকলে এই মহানগর ছাড়িয়ে হুল্লোড় নগর পরিক্রমা করব।

গলা খাটো করে জিত্কে বলল, কি রে, শাস্তিটা পছন্দ হলো?

চন্দ্রা হাসছে। জিতের মুখেও হাসির আভাস। বাচ্চুর দুগালে দুটো চুমু বসিয়ে মদন বিশ্বাস শিস দিতে দিতে বাংলো থেকে নেমে গেল।

পরদিন সকাল। চন্দ্রা নারায়ণের ছোট্ট ঝকঝকে বেবি অস্টিনটা হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঢুকতে দারোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম বাজালো। বেয়ারা

জমাদার অফিস পিওনরা আর একটু বেশি তৎপর হয়ে উঠলো কাজে। চন্দ্রা নারায়ণ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে রোজই সমস্ত হাসপাতালে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জুনিয়ার ডাক্তার আর উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায়। নার্সরাও সকালের জড়তা ভেঙে যেন সজাগ হয়ে ওঠে।

গাড়ি থেকে নেমে ডক্টর চন্দ্রা নারায়ণ কোনো দিকে বা কারো দিকে তাকায় না। টক টক করে সিঁড়ি তিনটে ভেঙে বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। তারপর ভিতরের করিডোর ধরে সোজা নিজের ঘরে চলে আসে।

আজও তার ব্যতিক্রম নেই। তাকে অনুসরণ করে একজন মাঝবয়সী নার্স হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। ফাইল আর রিপোর্টগুলো আগে থাকতে গুছিয়ে রাখতে হয়। এগিয়ে দিতে দেরি হলে সেটা বিরাগের কারণ হবে জানে। একে একে ফাইল এগিয়ে দিচ্ছে নার্স। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর খরচাপত্র সংক্রান্ত ফাইল। ফাইল সই হতে না হতে টেলিফোন।

সাড়া দিতে ওদিকের গলা পেয়েই চন্দ্রার মুখে হাসি ভাঙল। অপেক্ষারত নার্সের কাছে একটুও যেন স্বস্তির ব্যাপার।

—হ্যাঁ স্যার, বলুন।

টেলিফোনের ওধারে ডক্টর যাদব।—তোমাকে পাব কি পাব না ভাবছিলাম একেবারে ঠিক সময়ে হাজির দেখছি।

হাসছে চন্দ্রাও।—আই অ্যাম সেলডম লেট সার।

—ও ইয়েস, আই নো, তা ব্যাপারখানা কি, মিসেস কাপুরের কেসটা ছেড়ে দিলে?

এদিকে চন্দ্রার মুখে হাসি মিলালো।—হ্যাঁ স্যার, আপনি তো বড় কেসই চেয়েছিলেন, কিন্তু রাখা গেল না।

—কেন গো?

—মিস্টার কাপুরের বিহেভিয়ার ভালো না।

—ওদিকে ডক্টর যাদব যেমন বিস্মিত তেমনি ক্রুদ্ধ।—হোয়াট্! কাপুরের বিহেভিয়ার ভালো না! তোমার সঙ্গে?

চন্দ্রা হেসে ফেলল। আমার সঙ্গে না স্যার, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।
ডক্টর যাদব টেলিফোনেই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।—তাই বলো, ঘাবড়েই দিয়েছিলে তুমি আমাকে। তা কি হয়েছে?

—তিনি তাঁর স্ত্রীর কনডিশনের থেকে নিজের মেজাজের বেশি দাম দেন, আমি তাঁকে বার বার সাবধান করেছি—

—কিন্তু তা বলে কেস্‌টা একেবারে ছেড়েই দেবে···

—ছেড়ে দেবার মতোই ব্যাপার হয়েছে, দেখা হলে আপনাকে বলব··· আপনি আমাকে এ নিয়ে আর অনুরোধ করবেন না স্যার, হি নীড্‌স এ লেসন আপনার কেস বলেই আমি এত দিন সহ্য করেছি।

ওদিক থেকে ডক্টর যাদব বললেন—ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি যা ভালো মনে কর তাই করবে ··কিন্তু কাপুর আবার আমাকে টেলিফোনে ধরতে আমি যে আবার তাকে তোমার কাছেই যেতে বলে দিয়েছি, সে গিয়ে হাজির হলো বলে

হাতে একটা কার্ড নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চন্দ্রা টেলিফোনে বলল, হাজির হয়েছেন, আমার যা বলার বলে দিচ্ছি স্যার, আপনি যেন দোষ নেবেন না।

ডক্টর যাদব বললেন, টাকার কথা মাথায় থাকলে তুমি এ রকম পার্টি ছাড়তে না এটা বোঝা গেল বলে আমি বরং খুশি। ডু অ্যাজ্‌ ইউ লাইক।
রিসিভার নামিয়ে চন্দ্রা বেয়ারার রাখা কার্ডটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। গম্ভীর।—ডাকো।

বেয়ারা চলে গেল, তারপরেই কাপুর ঘরে ঢুকল। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, শৌখিন মানুষ। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় পয়সার জোর আছে। কিন্তু এই মুখেরও এখন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাবভাব। দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানালো।

চন্দ্রা সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। তেমনি গম্ভীর।—বসুন।
ভদ্রলোক বসল। পাশের নার্সটির দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে চন্দ্রা শুধু নার্সের দিকে তাকালো একবার। আর কিছু বলার দরকার হলো না, নার্স ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দ্বিধান্বিত সুরে কাপুর বলল, আপনি হঠাৎ চিঠি লিখে স্ত্রীর কেসটা ছেড়ে দিলেন, তাই—

চন্দ্রা ঠাণ্ডা কঠিন সুরে জবাব দিলো, হঠাৎ নয়, আপনাকে আমি আগেও ওয়ার্নিং দিয়েছি, ব্যাপারটা বুঝিয়েছি, কিন্তু সেদিন বাড়ি গিয়ে আপনার ভাইয়ের মুখে শুনলাম মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে আপনি আপনার স্ত্রীকে চড় পযন্ত মেরেছেন।

বিমর্ষ মুখে কাপুর বলল, কিন্তু আপনি জানেন না সে কি বাড়াবাড়ি করছিল, আর কুৎসিত গালাগাল করছিল, সকলের সামনে বাড়ির ঝি-টাকে নিয়ে পর্যন্ত সন্দেহ করে যা-তা বলছিল।

এবারে চন্দ্রা-ও অসহিষ্ণু একটু।—তাই করবে, তাই বলবে, আর সেই জন্যেই আমি। কারও পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলে আপনি তার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে জ্বর নামাতে চেষ্টা করেন? আপনাব এই চড় মারাটাও ঠিক তাই, ওই এক চড়ে আপনি আপনার স্ত্রীর ভালো হওয়ার আশা এক বছর পিছিয়ে দিয়েছেন, আপনার অঢেল টাকা, শহরেও ডাক্তারের অভাব নেই, যান!

কাপুর দু' হাত জোড় করে বলতে গেল আপনি এবারের মতো —

প্লীজ, এক্সকিউজ মি! চন্দ্রা প্রায় ঝাঁঝিয়েই উঠলো এবার।

কাপুর আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠলো। অনুতাপদগ্ধ মুখ। দরজার দিকে এক পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে আর অনুরোধ করার মুখ নেই...আমার স্ত্রী এই দু' দিন দু' ঘণ্টা ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করেছে...আর ছটফট করেছে...আর কেবল আপনার কথাই বলছে। এর মধ্যে অন্য ডাক্তার নিয়ে গেলে কি হবে আপনিও জানেন... আমি আশা করেছিলাম আমাকে ক্ষমা করতে না পারলেও আপনি আপনার পেশেন্টের কথা ভাববেন...তার তো কোনো দোষ নেই।

পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগলো।

—শুনুন!

কাপুর ফিরল। আশান্বিত একটু।

—আপনার স্ত্রীকে বলে দেবেন আজ বিকেলে...না, আজ হবে না, কাল হাসপাতাল সেরে আমি যাব।...আশা করছি এরপর তাঁকে চিকিৎসার

ব্যাপারে আপনাকে নিয়ে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

কাপুর হাঁপ ফেলে ঘন ঘন মাথা নাড়ল। তারপর আর একবার নমস্কার জানিয়ে প্রস্থান করল।

নার্স এসে এবার এক গোছা রিপোর্ট এগিয়ে দিলো। সেগুলো দেখে দু' ভাগে বাছাই করতে করতে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর মেহতা এসেছেন?

—এখনও আসে নি ম্যাডাম।

—হুঁ। বিরক্তির ভ্রূকুটি একটু। কতকগুলো কাগজ আলাদা করে ঠেলে দিলো।—এগুলো তাঁর টেবিলে যাবে।

এবারে নার্স আর একটা লেখা কাগজ দিলো, এটা হেড নার্স পাঠিয়েছেন— ওটা পড়া মাত্র চন্দ্রার মুখ গম্ভীর আবার। টেবিলের বোতাম টিপতে প্যাঁক করে শব্দ হলো একটা। বেয়ারা তক্ষুনি হাজির।

—নার্স রমা সাকসেনা –

বেয়ারা চলে গেল। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে রমা সাকসেনা জানতো বোধহয়। সে তক্ষুনি ছুটে এলো আর সবিনয়ে অভিবাদন জানালো।

—পরশু রাতে স্পেশাল ওয়ার্ডে তোমার ডিউটি ছিল?

—হ্যাঁ ডক্টর ম্যাডাম।

—হেড নার্স কমপ্লেন করছেন, ডিউটির সময় তুমি ঘুমুচ্ছিলে, পেশেন্ট ডাকাডাকি করেও তোমাকে পায় নি, হেড নার্সকে ছুটে যেতে হয়েছে… অ্যাণ্ড দিস ইজ নট দি ফার্স্ট টাইম।

মেয়েটার মুখ ভয়ে আরো চুপসে গেল।

চন্দ্রা সেই রিপোর্টের ওপর খসখস করে লিখল কিছু। তারপর সেটা বয়স্কা নার্সের হাতে দিয়ে অপরজনকে বলল, আমি তোমাকে তিন দিনের জন্য সাসপেণ্ড করলাম!

রমা সাকসেনা সকাতরে বলল, আর এ-রকম হবে না ডক্টর ম্যাডাম— চন্দ্রার কঠিন মুখ, গলার স্বর আরো কঠিন।—আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু লিসন্ এনিথিং…লীভ মি নাও।

মেয়েটা চলে গেল। আর আবেদনের সাহসও নেই।

এনিথিং এল্স? প্রশ্ন বয়স্কা নার্সের উদ্দেশ্যে।

সে মাথা নাড়তে চন্দ্রা টেবিলের ওপর থেকে নিজের কাগজ-পত্র ক'টা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পিছনে নার্স।

বাইরে এসে চন্দ্রা দেখে নার্স রমা সাকসেনা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ মুছছে। চন্দ্রা সোজা এগিয়ে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল। কাছে এলো।—তোমার এই কান্নাটা যদি টাকার শোকে হয় তো আমার কাছে যেও, লোকসান পুষিয়ে দেবো। আর যদি অনুতাপ হয় তো জেনো আমিই তোমার সব থেকে বেশি উপকার করলাম, সেবার কাজ ব্রত হিসেবে নিতে জানলে ডিউটির সময় আর চোখে ঘুম আসবে না।

করিডোর ধরে চলল চন্দ্রা। পিছনের তুজন নার্সই তার দিকে চেয়ে। একদিকে এই ব্যক্তিত্ব। সকলে সমীহ করে আবার শ্রদ্ধাও করে। ছাত্র-ছাত্রীরা এমন কি হাসপাতালের রোগী বা রোগিনীরা পর্যন্ত তাকে ভালবাসে। দেখলে দূর থেকে ছুটে আসে, সামনে পেলে ছাড়তে চায় না।

সকালের রাউণ্ডে বেরুলো চন্দ্রা নারায়ণ। সঙ্গে তিনটি ছাত্র একটি ছাত্রী। তাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে রোগী দেখে আবার সেই ফাঁকে ছাত্র-ছাত্রীদেরও যেটুকু পারে, শেখায়।

পর পর অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর। কোনো রোগী ঘরের মধ্যে, কেউ বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। যে যার নিজের মনে আছে, নিজের এক একটা অস্বাভাবিক কাজ বা অস্বাভাবিক চিন্তায় মগ্ন।

একটা ঘরে অল্পবয়সী এক ছেলে খসখস করে চেক বইয়ের মতো লম্বাটে কাগজের গোছায় টাকার অঙ্ক লিখছে আর নিজের নাম সই করছে। সদলে চন্দ্রা ঘরে ঢুকতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।—ডক্টর চন্দ্রা! আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম, ভালো একটা হাসপাতাল করার জন্য কত টাকা চাই আপনার? এক কোটি? দেড় কোটি?

আমতা আমতা করে চন্দ্রা চলল, আমি তোমার কাছ থেকে তু' কোটি আশা করেছিলাম—

ছেলেটা আনন্দে হেসে উঠলো, বলুন সে-কথা, আমার টাকার অভাব! কত লোককে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিলাম। দাঁড়ান, তু'কোটি টাকারই চেক দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে—

সোৎসাহে চেক্ লিখতে বসে গেল।
গলা খাটো করে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রা বলল, এম. ডি. পি.।
তেমনি খাটো গলায় একজন প্রশ্ন করল, ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস?
চন্দ্রা মাথা নেড়ে সায় দিলো।—অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত আনন্দ, অতিরিক্ত সবকিছু—একটু বাধা দিয়ে দেখো ফ্লেয়ার আপ করবে।
রোগীর চেক লেখা শেষ।—এই নিন, সোজা ব্যাঙ্কে চলে যান।
ছাত্রীটি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ক্যাশ হবে তো?
সঙ্গে সঙ্গে রোগীর উগ্র মূর্তি।—হাউ ডেয়ার ইউ! আমাকে অবিশ্বাস! গেট আউট! আই সে গেট আউট—একমাত্র ডক্টর চন্দ্রা ছাড়া আমার দাম কেউ বোঝে না কেউ না!
পরের ঘরে দুজন রোগী। একজন একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে, বন্ধুগণ, আর ভয় নেই, আমি ঈশ্বরের দূত, ঈশ্বর আমার মারফৎ তোমাদের বাণী পাঠিয়েছেন, আর এদেশে জেলখানা থাকবে না—অত্যাচার থাকবে না!
অপর রোগীটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।—জেলখানা থাকবে না, অত্যাচার থাকবে না—কি আনন্দ!
—আমি ঈশ্বরের দূত বলছি, এতদিন তোমরা অনেক দুঃখ পেয়েছ, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছ—
অন্য রোগীটি কান্নার মুখেই হি হি করে হাসতে লাগল।—উঃ কি দুঃখ, কি অত্যাচার!
বাইরে এসে চন্দ্রা সঙ্গের ছেলেমেয়েদের বোঝালো, স্কিজোফ্রেনিয়া, স্প্লিট ইন পারসোনালিটি, একজন ঈশ্বরের বাণী শুনছে বা নিজেই ঈশ্বর হয়ে বসেছে—আর একজন আনন্দের কথা শুনে কাঁদছে আর দুঃখের কথা শুনে হাসছে।
পরের ঘরের আর একটি রোগী জানালা দিয়ে ওদের দেখেই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল, তারপর আড়ি পেতে শোনার মতো করে শুনতে চেষ্টা করল। যেন ভীষণ বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র কিছু এক্ষুনি শুনবে।
চন্দ্রা বলল, এও স্কিজোফ্রেনিয়ার কেস, ও ভাবছে সর্বদা সকলে তার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করছে, তাকে ফলো করছে। এও কখনো অতিরিক্ত ভায়োলেণ্ট হতে পারে আবার কখনো অতিরিক্ত উইথ্‌ড্রন হতে পারে।

আর এক দিকের একটা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে এক রমণীর আর্ত চিৎকার। গলার কাছে দু'হাত চেপে যন্ত্রণায় আর্তস্বরে বলে উঠলো, আপনি এসেছেন ডঃ চন্দ্রা—আমাকে বাঁচান—আমার মাথাটা এনে দিন। মাথা ছাড়া আমি বাঁচব কি করে—মরে গেলাম—মাথাটা আমার এনে দিন দয়া করে!

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, আপনার মাথা কোথায়?

ঘরের ছাদ দেখিয়ে দিলো রোগিনী।—ওই যে! ওখানে গিয়ে আটকে আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? পাচ্ছেন তাহলে এনে দিন!

চন্দ্রা বলল, দিচ্ছি, আপনি মাথাটার দিকে চেয়ে থাকুন, সরে না যায়। রোগিনী ঘাড় উঁচিয়ে ছাদের দিকে চেয়ে রইল। চন্দ্রা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে টেবিলের আয়নাটা নিয়ে এসে তার পায়ের কাছে রাখল।—এবার এদিকে চেয়ে দেখুন তো আপনার মাথাটা নেমে এসেছে কি না?

আয়নার দিকে চেয়েই কান্নার মুখে ভরাট হাসি। বলল, নেমে এসেছে, নেমে এসেছে—আপনি কত ভালো ডক্টর চন্দ্রা, আপনি আজ আমাকে বাঁচালেন।

ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে চন্দ্রা জিগ্যেস করল, এটা কি কেস্ বলো দেখি? একজন একটু অনিশ্চিত সুরে জবাব দিলো, কমপাল্‌সিভ থট্?

—কমপাল্‌সিভ বিহেভিয়ারও বলতে পারো। আসলে এটা অবসেশন। কেস্ হিস্ট্রি হলো, মহিলার স্বামী তাকে ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করেছে—কিন্তু তার ঢের আগে থেকে মহিলা তার স্বামীর মন জানত—তার মাথায় ভয় ঢুকেছিল স্বামী ঘুমের মধ্যে বা যখন হোক ফাঁক পেলেই তার গলা কেটে ফেলবে। সেটাই অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করিডোর ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। বাইরের রোগীরা কেউ কতগুলো পাথরকুচি গুণছে তো গুণছেই, কেউ বা প্রত্যেকটা থাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটছে। চন্দ্রা নারায়ণ এ দৃশ্য রোজ দেখে, কিন্তু কখনো কাউকে অবহেলা করে না। মিষ্টি হেসে কাউকে উৎসাহ দেয়, কারো বা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে একটু বাড়তি খাতির দেখিয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা এ-ও লক্ষ্য করে। এবারে

যে ঘরে ঢুকল, সেখানে পাজামা পাঞ্জাবী পরা বছর তিরিশ বত্রিশের একটি লোক, সুন্দর মিষ্টি চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পাশের ছোট টেবিলের ওপর আঁকার সরঞ্জাম। সামনের স্ট্যাণ্ডে ছবি আঁকার ক্যানভাসের ওপর পাতলা কাপড়ের আবরণ। লোকটি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে সেদিকেই চেয়ে ছিল।

ছাত্র-ছাত্রী সহ চন্দ্রা ঘরে ঢুকতেই লোকটি সানন্দে উঠে দাঁড়ালো। এক-মুখ হেসে বলল, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম ডক্টর চন্দ্রা, আমার মাস্টারপীস আঁকা কমপ্লিট!

—তাই নাকি? চন্দ্রা সাগ্রহে ক্যানভাস আঁটা ইজেলের দিকে ঘুরে তাকালো কিন্তু তার ওপরে আবরণ থাকায় ভিতরের মাস্টারপীস দৃষ্টির আড়ালে।—দেখাবেন না?

শিল্পী বলল, আপনাকে দেখাব বলেই তো বসে আছি। পরিতুষ্ট মুখে ইজেলের দিকে এগিয়ে জানান দিলো, আমার এই মাস্টাপীস-এর নাম, 'দি চেজ্ ফিউটাইল!' মানে নিষ্ফল পশ্চাদ্ধাবন···

চন্দ্রা মন্তব্য করল, চমৎকার নাম—দেখান।

ছাত্র-ছাত্রীরাও উৎসুক। শিল্পী আস্তে ক্যানভাসের ওপর থেকে আবরণটা সরালো। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা হাঁ। চন্দ্রাও সামান্য প্রস্তুত।

মস্ত ক্যানভাসে তুলির একটা আঁচড়ও পড়ে নি। সবটাই সাদা। তবু চন্দ্রা দেখা আর বোঝার ভান করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার 'দি চেজ ফিউটাইলে'র বিষয়বস্তু কি?

প্রসন্ন মুখে জবাব দিলো, বিষয়বস্তু বাইবেল থেকে নেওয়া, উন্মত্ত মিশর-বাসীরা তাড়া করে আসছে, কিন্তু যীশুর কৃপায় লোহিত সাগর দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখান দিয়ে তার ভক্ত ইজরায়েলরা পালিয়েছে।

চন্দ্রা সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনার এ ছবিতে লোহিত সাগর কোথায়?

শিল্পী জবাব দিলো, বাইবেলে আছে লোহিত সাগর পরে বহু পিছনে সরে গেছে।

—ও···তা ভক্ত ইজরায়েলরা কোথায়?

—তারা তো পালিয়েই গেছে, তাদের দেখতে পাবেন কি করে ?
—তাই তো···আর, যে মত্ত মিশরবাসীরা তাড়া করে আসছে ?
হৃষ্ট মুখে শিল্পী জবাব দিলো, তারা এখনো এসে পৌঁছয় নি।
ছাত্র-ছাত্রীরা চেষ্টা করে হাসি চাপছে। কিন্তু চন্দ্রা শিল্পীর হাত ঝাঁকিয়ে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালো।—কংগ্রাচুলেশন্‌স, ইট ইজ্‌ এ রিয়াল মাস্টারপীস !
শিল্পী খুশিতে বিগলিত।
বাইরে পা দিয়েই চন্দ্রা ছাত্র-ছাত্রীদের ধমকে উঠলো।—তোমাদের হাসি পাচ্ছিল কেন ? আনফুলফিলড্‌ অ্যামবিশনের অ্যাবারশন তোমাদের হাসির জিনিস ?

চন্দ্রা নারায়ণের আধা বৃত্তাকারের বাংলোর বাঁদিকের কোণের ঘরটায় রোগী দেখা হয়, আবার সাইকো-অ্যানালিসিস চেম্বারও ওটাই। ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। টেবিলের ফুলদানিতে টাটকা ফুলের গোছা। টেবিলের একদিকে চন্দ্রার বসার চেয়ার, সামনে রোগীদের। পাশে একটা গদী আঁটা ইজিচেয়ার। অ্যানালিসিসের রোগীরা সাধারণত ওই চেয়ারে হাত-পা ছেড়ে আরাম করে বসে মনের কথা বলে যায়। কোণের ধূপ-দানিতে মিষ্টি গন্ধের ধূপ জ্বলে।
চেম্বারের সামনের ঢাকা বারান্দাতেও রোগীদের জন্য সারি সারি চেয়ার পাতা। রোগীরা সেখানে বসে অপেক্ষা করে। এক একটি রোগীকে বিদায় করে চন্দ্রা নিজেই বেরিয়ে এসে পরের রোগীকে ভিতরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে।
বাইরে আট-দশজন রোগী অপেক্ষা করছে। চন্দ্রা একে একে তাদের ডাকছে। দেখছে। ছেড়ে দিচ্ছে।
রোগীর সংখ্যা কমছে। তাদের মধ্যে বছর আটাশ তিরিশের একটি সুশ্রী লোক চুপচাপ বসে ছিল। এবারে চেম্বার থেকে বেরিয়ে অন্য রোগী ডাকার ফাঁকে চন্দ্রা তাকে বলল, আপনি একটু আগে এসে গেছেন মিস্টার দত্ত, অ্যানালিসিসের কেস আগে ডাকার উপায় নেই।

লোকটি বলল, আমি অপেক্ষা করছি।

বাংলোর সামনের দিকের দেয়ালের ঘড়িতে পাঁচটা দশ। জিত্‌নারায়ণ আপিস থেকে ফিরল। বাংলোয় উঠে বাঁয়ের চেম্বারের দিকে তাকালো। সেখানে তখন কেবল সেই সুশ্রী মতো লোকটি বসে। জিত্‌ গম্ভীর মুখে একবার তাকে দেখে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

শেষের রোগিনীকে ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রা বাইরে এলো। শ্রান্ত একটু। ডাকল, আপনি আসুন মিস্টার দত্ত।

তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বারান্দার সামনের দিকে চোখ গেল চন্দ্রার। থামল একটু। সেখানকার সোফায় জিত্‌ বসে আছে। সেও এদিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতে জিত্‌ সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

চন্দ্রা চেম্বারে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। রোগীকে বলল, আপনি ওই চেয়ারে আরাম করে বসুন, আমি আপনার পছন্দের ধূপটা আগে জ্বেলে দিই—

লোকটা বসল। ধূপ জ্বালতে জ্বালতে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, এখন আছেন কেমন, মাথা আগের থেকে একটু হালকা লাগছে?

—অনেক হালকা লাগছে। লোকটার খুশি মুখ, আমি তো সপ্তাহের এই দুটো সিটিংয়ের দিনের জন্য হাঁ করে থাকি এখন।

চন্দ্রা হাসল।—শিগগীরই সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।

নিজের চেয়ার ভদ্রলোকের একটু কাছে টেনে নিয়ে বসল। টেবিলের এধারে বাঁধানো খাতা, পাশে কলম।

—বলুন, যা আপনার মনে আসে বা যা আপনার বলতে ইচ্ছে করে, বা যা আপনার বলতে ইচ্ছে করে না অথচ মনে আসে—

রোগী মোটামুটি জানে, সে চোখ বুজে বলা শুরু করল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। চন্দ্রা একমনে নোট নিচ্ছে, মাঝে মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে, কখনও বা উৎসাহ দেবার জন্য হেসে মাথা নাড়ছে।

টেলিফোন বেজে উঠলো।

—এক মিনিট। চন্দ্রা উঠে টেলিফোনের রিসিভার তুলে সাড়া দিলো।

ফোনটা এলো এক পরিচিত বয়স্ক পেশেন্টের বাড়ি থেকে। সম্প্রতি সেই রোগীর চিকিৎসা করছেন ডক্টর যাদব। ডক্টর যাদবের অনুরোধে চন্দ্রাও তাঁর সঙ্গে গিয়ে দু'দিন সেই পেশেন্ট দেখে এসেছে। আগে হার্টের রোগী ছিল ভদ্রলোক, যখন তখন ব্যথা উঠত, তখন মরফিন ইনজেকশন দিতে হতো। ভদ্রলোকটি যেমন অবুঝ তেমনি অল্পেতে দিশেহারা। রাগীও খুব। যত না ব্যথা ওঠে তার পাঁচগুণ উথাল পাথাল করে, আর মরফিন ইন-জেকশন দেবার জন্য ঝোলাঝুলি করে। না দিতে চাইলে ক্ষেপে যায়। তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে বলে চেঁচামেচি বকাবকি করে। হার্টের ব্যথার নালিশ আর মরফিনের তাগিদটা ক্রমশ মানসিক বিকারের দিকে গড়াচ্ছে দেখে বড় জেনারেল ফিজিশিয়ান রোগীকে ডক্টর যাদবের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। নিতান্ত খারাপ না বুঝলে মরফিন দেওয়া নিষেধ।
চন্দ্রা শুনল, রোগী এখন বুকের যন্ত্রণায় পাগলের মতো ছটফট করছে, আর মরফিনের জন্য ক্ষেপে উঠছে। মাঝের ক'দিন ডক্টর যাদবের চিকিৎসায় এ-রকম অসহিষ্ণুতা দেখা যায় নি। কিন্তু এখন নাকি সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি করছে, কিছুতে তাঁকে ঠাণ্ডা করা যাচ্ছে না, অথচ বাড়ির লোকের ধারণা বুকের ব্যথা নয়, মনের বিকারে এ-রকম করছে। কিন্তু ডক্টর যাদবকে টেলিফোনে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁর বাড়িতে খবর দিয়ে রাখা হয়েছে, ফেরা মাত্র যেন চলে আসেন। কিন্তু এতক্ষণ অপেক্ষা করেও তাঁকে ধরা যায় নি, এদিকে রোগীকেও আর রাখা যাচ্ছে না—এ অবস্থায় ডক্টর মিসেস চন্দ্রা নারায়ণ এসে যদি খানিকক্ষণের জন্য যা হোক করে রোগীকে একটু সামলে রাখতে পারে—ডক্টর যাদব খবর পাওয়া মাত্র নিশ্চয় চলে আসবেন।
ওই বয়স্ক পেশেন্টটি ডক্টর যাদবের প্রিয়জনদের একজন চন্দ্রা জানে। বিপাকে পড়ে তাঁর ছেলে কাকুতি মিনতি করে একবার ওকে যেতে বলছে অগত্যা ফোনে চন্দ্রা বলে দিলো, আচ্ছা আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি। রিসিভার রাখার পরেই কি মনে পড়তে বিব্রত মুখ। সামনের রোগীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল একটু। বলল, আমার নিজের কেমন ভুল দেখুন, ছ'টায় অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, অথচ বলে দিলাম যাব। আচ্ছা মিস্টার

দত্ত, আজ এ-পর্যন্তই থাক—আবার নেক্‌স্ট দিন।

ভদ্রলোক অনিচ্ছাসত্ত্বেই দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। আরও মিনিট পনেরো থাকতে পারে ভেবেছিল।

চন্দ্রাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বারান্দার সামনের দিকে এলো। ছেলে বাচ্চু সেখানেই লাফালাফি করছিল, ছুটে কাছে এলো।—মা, জোসেফ কাকু আর আমরা সকলে বেড়াতে বেরুব না আজ?

—বেরুব বেরুব···তোর বাবা কোথায়?

ছেলে আঙুল তুলে চেম্বারের দিকটাই দেখিয়ে দিলো, ওই তো।

চন্দ্রা ঘুরে তাকাল। অবাকই একটু তাছাড়া জিতেরও কেমন অপ্রস্তুত ভাব। কাছে এসে হাসতে চেষ্টা করে বলল, আজ ছ'টার দশ মিনিট আগেই কাজ শেষ যে, এ রকম তো বড় দেখা যায় না—

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই সেরে ফেললাম, তুমি ওদিকে কি করছিলে?

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত মুখ জিতের।—ওদিকে আমার কি করব, সব দিকেই ঘুরছিলাম।

—যাক, শোন, আবার একটু ফ্যাসাদে পড়েছি, জোসেফ তো এক্ষুনি এসে পড়ল বলে, কিন্তু আমার আধঘণ্টার জন্যে একটু না বেরুলেই নয়। বড় জোর চল্লিশ মিনিট, তার বেশি দেরি হবে না, তোমরা রেডি হয়ে থেকো, ওকেও বোলো।

জিত্ গম্ভীর।—কোনো রোগীর বাড়ি থেকে জরুরী তলব বোধহয়?

—বুঝতেই তো পারছ। কথা বললেই দেরি, চলি।

বাংলোর সিঁড়িতে তার বেবি অস্টিন দাঁড়িয়েই আছে। চোখের পলকে বেগে ওটা বাংলো থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোনে রোগীর বাড়ির লোক বাড়িয়ে কিছু বলে নি। বয়স্ক মানুষটার সত্যিই যন্ত্রণায় উথাল-পাথাল অবস্থা। ছটফট করছে, ঘামছে। চন্দ্রাকে দেখেই বলে উঠলো, রোগী মরে গেলেও বড় ডাক্তাদের দেখা মেলা ভার আর এরাও যে কাউকে ডেকে একটা ইনজেকশান দিয়ে দেবে তা না—মরে গেলে তো ওদের কিছু অসুবিধে নেই, বাপের যা আছে নিশ্চিন্তে

ভোগ করবে।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি!

—আর দেখবে কি মা—যা হোক কিছু কর, এরপর আর সময় পাবে?

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি তাব পাশে বসে পালস্ দেখল। তারপর ব্লাড প্রেসারের যন্ত্র বার করে প্রেসাব দেখল। তাবপর তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বার কবে একজনকে বলল সেটা গুঁড়িয়ে আনতে। তাই শুনে হোক বা যে কারণে হোক, ভদ্রলোক মুখটাকে বিকৃত করে ফেলল। জল-সহ ওষুবটা গলায় দিয়ে চন্দ্রা বলল, পাঁচটা মিনিট দেখুন, আমার মনে হয় ভালো লাগবে।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের আগেই ভদ্রলোকের ছটফটানি আরো বাডতেই থাকল। সেই সঙ্গে দরদর করে ঘাম।

চন্দ্রা সামনে ঝুঁকল, ব্যথা বাড়ছে?

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ভদ্রলোক বুকের বাঁদিকটা দেখিয়ে দিলো।

চন্দ্রা উঠলো। তার ব্যাগেই মরফিনের বাক্স মজুত। সেটা বার করল। একটু এদিকে সরে এসে ইনজেকশনের সিরিঞ্জে নীড্‌ল লাগিযে স্পিরিট দিয়ে সেটা পবিষ্কার করতে লাগল। রোগী ঘাড বাঁকিয়ে দেখে একটু যেন স্বস্তি বোধ কবে মুখ ফিরিয়ে নিল। সেই ফাঁকে তার ছেলে শশব্যস্তে কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, মরফিন দেবেন না ডক্টর মিসেস নারায়ণ, ডক্টর সিদ্ধান্ত আর ডক্টব যাদব তুজনেই বাবণ কবেছেন। এ-রকম আমরা ক'দিন ধরেই দেখছি, আজ একটু বেশি···

চন্দ্রার হাত থেমে গেল।···সোজা সেই ছেলের দিকে তাকালো।—আপনি ডাক্তার?

থতমত খেয়ে ছেলে মাথা নাড়াল। অর্থাৎ না।

সিরিঞ্জসুদ্ধ হাতটা দরজার দিকে বাড়িয়ে দিলো চন্দ্রা।—ওখানে গিয়ে দাঁড়ান, আমার কাজে ডিসটার্ব করবেন না!

ছেলেটা সরে গেল।

চন্দ্রা অ্যামপুলের মুখ কেটে সিরিঞ্জে ওষুধ টেনে নিল। তারপরে ইনজেক-শন দিলো। অদূরে ভদ্রলোকের ছেলে আর স্ত্রী আর যারা ঘরে ছিল,

সকলেরই বিরূপ মুখ।

সিরিঞ্জ ব্যাগে পুরে চন্দ্রা রোগীর পাশে বসল। বলল, ভুল হয়েছে, ইনজেকশনটা আগে পড়লে এত কষ্ট হতো না—

ক্লান্ত গলায় ভদ্রলোক বলল, এরা সব ডাক্তারের ওপর দিয়ে যায়।

চন্দ্রা ঘরের সকলের দিকে তাকালো। তারপর বলল, ঘরে এত ভিড় করলে অসুবিধে হবে, আপনারা যান, আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখে যাচ্ছি।

ক্রুদ্ধ মুখেই তারা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

চন্দ্রা রোগীর কপালে হাত রাখল।—আপনি চোখ বুজে আর একটু সহ্য করুন, এক্ষুনি যন্ত্রণা কমে যাবে, ঘুমও আসবে।

প্রায় মিনিট পনেরো রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো চন্দ্রা। তার মধ্যে ভদ্রলোক অঘোর ঘুমে।

চন্দ্রা বেরিয়ে এলো। ভদ্রলোকের ছেলের মুখোমুখি। নীরস স্বরে ছেলে বলল, ডাঃ যাদব এইমাত্র এসেছেন, ওঘরে আছেন, আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।

ডক্টর যাদব পাশের ঘরে একটা চেয়ারে গা ছেড়ে বসে ছিলেন। চন্দ্রা ঘরে ঢুকতে সোজা হলেন।—কি রকম দেখলে ?

—ভালোই তো··· ।

—প্রেসার ?

—হানড্রেড নাইনটি বাই নাইনটি।

ডক্টর যাদব বললেন, রাদার গুড···তাহলে কি ব্যাপার, প্লেন ওয়াটার ইনজেক্ট করলে ?

চন্দ্রা হাসল।—হ্যাঁ স্যার। তাতেই কাজ হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ডক্টর যাদব জোরেই হেসে উঠলেন। বললেন, এরা সব রেগেই অস্থির শুনে আমি তক্ষুনি বুঝেছি। ঘরের লোকদের হাসতে হাসতে বললেন, নাও ইউ নো, হোয়াট এ জেম সী ইজ্‌!

সকলেই যথার্থ অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত।

ডক্টর যাদব উঠে দাঁড়ালেন। চন্দ্রাকে বললেন, চলো হাতে মোটে সময়

নেই।

নীচে নেমে চন্দ্রা দেখে শুধু তার গাড়ি দাঁড়িয়ে, প্রোফেসর যাদবের গাড়ি নেই। জিজ্ঞেস করল, আপনার গাড়ি স্যার?

তোমার গাড়ি দেখেই আমার গাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি, ডেলিগেটদের যদি দরকার হয়—

চন্দ্রা অবাক।...ডেলিগেট্‌দের!

কাঁধে হাত দিয়ে চন্দ্রাকে গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, কানাডা থেকে চারজন এক্সপার্ট এসেছেন, দিল্লীতে কোথায় কোথায় আমার নাম শুনে তাঁরা এখানে এসে হাজির এঁদের মধ্যে একজন মহিলাও আছেন ...সকাল থেকে তো আমি এঁদের নিয়ে ব্যস্ত—তোমাকে একটা ফোন করারও ফুরসৎ পাই নি ...রাতে আমার ওখানে তাঁদের ডিনার, ইউ মে গেইন এ লট্ ফ্রম দেম...তোমার কথা আমি তাঁদের বলেও রেখেছি।

চন্দ্রা এবারে সত্যি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। একদিকে এমন লোভনীয় যোগাযোগ, অন্যদিকে জোসেফ জিত্ ছেলে সকলে অপেক্ষা করছে তার জন্য। এমনিতেই চল্লিশ মিনিটের জায়গায় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে।

দ্বিধার সুরে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, ওঁরা কাল থাকবেন না স্যার?

- না, আর্লি মর্নিং-এ চলে যাবেন। কেন, তোমার কোনো জরুরী অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে নাকি?

চন্দ্রা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

—কোনো সিরিয়াস কেস্ কিছু? তাহলে সেরে নিয়ে চল, আমি গাড়িতে ওয়েট করব 'খন। কানাডার ডেলিগেট তো আর পাঁচবার আসবে না! কুইক্—

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চন্দ্রা বলল, না স্যার, ঠিক আছে, আপনি গাড়িতে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

ওই বাড়িতেই ঢুকল আবার। ফোন করবে শুনে বাড়ির লোক নিচের ঘরের ফোন দেখিয়ে দিলো। রিসিভার তুলে চন্দ্রা নম্বর ডায়েল করল।

...হ্যালো জিত্...হঠাৎ মুশকিলে পড়ে গেলাম...কানাডা থেকে আমাদের লাইনের চারজন এক্সপোর্ট ডেলিগেট এসেছেন...রাতে ডক্টর যাদবের

ওখানে তাঁদের সঙ্গে মিট্ না করলেই নয়···তুমি লক্ষ্মীটি জোসেফ আর বাচ্চুকে বুঝিয়ে বোলো···কথা বলছ না কেন? রাগ করলে নাকি··· তুমি বুঝছ না এটা কত বড়···

ওদিক থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার খট্ করে শব্দ হলো একটা। চন্দ্রা তবু ডেকে উঠলো, হ্যালো! জিত্—

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটু রাগত মুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এই এক মানুষের অবুঝপনা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

ছাড়া পেয়ে চন্দ্রা নারায়ণ ঘরে ফিরল রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। পাশা-পাশি তিনটে শোবার ঘর। এক ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরের দরজা। বাইরের দিকের দরজাগুলো বন্ধ। তুটো ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে, শেষের ঘরটা অন্ধকার।

এদিকের ঘরে বাচ্চু তার খাটে ঘুমিয়ে। পাশের চৌকিতে লীলামাসিও ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটার মাথাটা বালিশ থেকে পড়ে গেছে। চন্দ্রা মাথা ঠিক করে দিয়ে আলতো করে তার কপালে চুমু খেল একটা। তারপর মাঝের দরজা দিয়ে এ ঘরে এলো। জিত্‌ও ঘুমুচ্ছে। তার গায়ের চাদরটা সরে গেছে, উস্কো-খুস্কো চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে। মাটিতে স্যাণ্ডাল জোড়া ঠিক খাটের দিকে মুখ করা। চন্দ্রার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি—রাতের ঘুমের চোখে ওই উল্টো-মুখো স্যাণ্ডাল পরতে গিয়ে প্রায়ই কি কাণ্ড করে সেই দৃশ্য মনে না পড়ে পারে না। এগিয়ে এসে প্রথমেই বাঁ হাতে স্যাণ্ডাল জোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রাখল। তারপর সোজা হয়ে গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে সন্তর্পণে মুখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলো। পাশে নিজের শয্যার দিকে ফিরতে গিয়েই বিষম চমক। অন্ধকার ঘরের দরজার ওধারে আবছা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে জোসেফ মদন বিশ্বাস, তার মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সে এদিকেই চেয়ে আছে।

—কি আশ্চর্য! দরজা দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকে জোসেফের পাশ কাটিয়ে চন্দ্রা আলোটা জ্বালাল।—এরা সব ঘুমুচ্ছে আর তুমি বাড়িই যাওনি এখনো?

জোসেফের মুখে যেন মজার ছোঁয়া লাগল একটু। জবাব দিলো, যাই নি বলেই তো বেশ সুন্দর কিছু দেখার সুযোগ হলো···অথচ ওই গাধাটা রাগের চোটে ঘুমিয়েই পড়ল।

চন্দ্রা হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, রেগে টং হয়ে ছিল বুঝি?

—শুধু টং! ছেলেটাকে পর্যন্ত এমন তাতিয়েছে যে সে-ও তোমাকে এক হাত নেবার জন্য জেগে থাকতে চেষ্টা করছিল।

চন্দ্রা বলল, কি করি বলো, এই জন্যেই এক-এক সময় ভালো লাগে না —এমন মুশকিলে পড়ে যাই না—

সিগারেটে একটা বড় টান দিয়ে মদন বিশ্বাস তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—হাসছ যে?

—হাসছি, কারণ তুমি সত্যি কথা বলছ না। ভালো না লাগলে বা সত্যিই মুশকিল ভাবলে অসময়ে তোমার নাগাল কেউ পেত না।

চন্দ্রা হেসে প্রায় স্বীকার করে নিল।

পরের মুহূর্তে চিন্তিত।—কিন্তু এত রাত্রে দু'মাইল পথ হেঁটে তুমি যাবে কি করে? কি যে করো না, চলো, ছেড়ে দিয়ে আসি!

—থাক, থাক, এতটা সহ্য হবে না···লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাব···যাক্, চট্ করে কড়া কিছু ঘুমের ওষুধ দাও তো, হাঁটার পর ঘুমটা জমবে ভালো।

চন্দ্রা সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো!—ফের?

—কি ফের?

চার মাস টো-টো কোম্পানি করে ফিরে এসেই আবার তোমার ঘুমের ওষুধ লাগবে? কতদিন বারণ করেছি না!

এবারে বিরক্ত মুখ মদন বিশ্বাসের। সিগারেটটা জোরেই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।—দেবে তো দাও, নইলে আবার আধ মাইল বেশি ঘুরে নাইট সারভিসের দোকান থেকে কিনে নিয়ে যেতে হবে।

চন্দ্রা মুখের দিকে থমকে তাকালো একটু। না দিলে তাই করবে জানা কথা। এগিয়ে এসে দেয়াল আলমারির কাচের পাল্লা সরিয়ে একটা ফাইল বার করে তার থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে ওর হাতে দিলো। বলল,

শরীরটাকে কিন্তু তুমি নিজেই মাটি করছ জোসেফ, মহানগরে এলেই তোমার সেই পুরনো ভূত কাঁধে চাপে !

ওষুধ হাতে পেয়ে টিপে টিপে হাসল মদন বিশ্বাস। · পুরনো ভূত না পেত্নী ?

হেসে ফেলেও চন্দ্রা ঝাঁঝের সুরে বলল, পেত্নী জেনেও দশ বছরে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে না, বলতে লজ্জা করে না ? যত হেসে খেলেই বেড়াও তুমি, আমার কিছু বুঝতে বাকি আছে ?

—ব্যস ব্যস ব্যস ! মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে মদন বিশ্বাস তাকে থামিয়ে দিলো।···নো বক্তৃতা প্লীজ, গুড নাইট—

বড় বড় পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রা সেদিকে চেয়ে রইল। লোক-টার প্রতি তার অগাধ মায়া। আবার তার জন্য কেন যেন ভাবনাও।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে জোসেফ মদন বিশ্বাস জীবনটাকে একে-বারে হেলায় কাটিয়ে দিলো। এ-রকম খেয়াল-খুশির মধ্যে চলা তার চরিত্রের একটা দিক বটে। কিন্তু মানসিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে চন্দ্রা মনের দিকটাও ভালই বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু সময় সময় জোসেফকে সঠিক বুঝে উঠতে পারে না। থেকে থেকে কেবলই মনে হয় বাইরে যেমন দেখে সে-টুকুই সব নয়। নিজের জীবনটাকে সব সময় তুচ্ছ করার একটা ঝোঁক ওর। নিভৃতের কোনো ক্ষোভ জমাট বেঁধে না থাকলে এ-রকম হবার কথা নয়।

···বিদ্যা দীক্ষিতের সঙ্গে চন্দ্রার আর দেখা হয় নি। জোসেফেরও হয়েছে কিনা সন্দেহ। চন্দ্রা আর জিতের বকাবকিতে পড়ে সে-ও এখানে ছোট-খাটো একটা বাংলো ভাড়া নিয়েছে। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায় আবার ফিরে আসে। ফাঁক পেলেই চন্দ্রা ওর বিয়ের কথা তোলে, বকাবকি করে। ওর ধারণা ওই এক মেয়ে এখনো জোসেফের মন থেকে সরে যায় নি। বিদ্যা দীক্ষিতের এত দিনে নিশ্চয় ঘর সংসার ছেলেপুলে হয়েছে। কিন্তু ওই জোসেফের কাছে হয়তো এতদিনেও সে সেই মেয়েই আছে। এ-রকমই হয় অনেক সময়। এই মানসিকতা কাটিয়ে ওঠার একটা সহজ রাস্তা আছে। জোসেফকে চন্দ্রা সেদিকে অনেকবার ঠেলতে চেষ্টা করেছে।

বলেছে, বিভা দীক্ষিতের কেমন বিয়ে হলো, ঘর-সরসার কেমন, ছেলেপুলে কি —একবার দেখে এসো না।

তার ধারণা ছেলেপুলের মা বিভা দীক্ষিতের সংসারী চেহারাখানা দেখলে অমন আত্মকেন্দ্রিক প্রেমকাণ্ডর ঝামেলা চলে যেত। কিন্তু জোসেফ কানেই তোলে না।

অনেক রাত পর্যন্ত চন্দ্রার ঘুম এলো না। জিতের কথা ভাবছে, ছেলের কথা ভাবছে। সত্যি এরা কতক্ষণই বা পায় ওকে। চন্দ্রা মনে মনে ঠিক করল এবার থেকে বাইরের কাজ কিছু কমাতে চেষ্টা করবে। ছেলেটাকে মনের মতো মানুষ করতে হবে। বাপের যেমন হালছাড়া দশা, তার দ্বারা কিছু হবে বলে মনে হয় না। স্ত্রীর এত নাম ডাক যশ সে-যেন ওর কিছু নয়। স্ত্রীদের স্বামী-গর্ব থাকতে আছে, পুরুষদেরও তেমনি স্ত্রী-গর্ব থাকতে নেই কেন?

পর পর তিন দিন আবার জোসেফের দেখা নেই। এ-রকম উধাও হওয়াটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু চার মাস বাদে এসে এরই মধ্যে আবার সরে পড়বে ভাবে নি।

অফিসের কাজ ছেড়ে ওঠার মুখে টেলিফোন বেজে উঠলো। চন্দ্রা রিসিভার তুলে সাড়া দিতে ওদিকে থেকে জিত্ বলল, তোমার হনুমান এসেছে। তার পাশে বসে মদন বিশ্বাস সিগারেট টানছে। শুনে ঘুরে তাকালো। শুকনো টান ধরা মুখ।

ওদিক থেকে একটু ব্যস্ত হয়ে চন্দ্রা বলল, জোসেফ এসেছে! এই তিন দিন কোথায় ছিল?

—বলছে শরীর খারাপ হয়েছিল।

—ওকে দাও।

মদন বিশ্বাস সাড়া দিতে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল, জ্বর-টর কিছু?

বিরক্তির সুরে মদন বিশ্বাস শুধু বলল, নাঃ!

—তার মানে ফের মেজাজ খারাপ রোজ ঘুমের ওষুধ গিলছো তো?

—গিললে স্ট্রাগল্ করতে হতো না।

—তাহলে লক্ষ্মী ছেলে বলতে হবে। শোন, দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ খাব, খবরদার পালাবে না।

জোসেফের খুশি মুখ না। জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণে ফিরছ?

—বড় জোর এক ঘণ্টা, নতুন ট্রেনিং-এ এসেছে একদল, তাদের একদফা উৎসাহ জুগিয়ে তবে ছুটি।

নতুন ট্রেনিদের উৎসাহ জোগাবার কথা বলল বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে উৎসাহ চন্দ্রার তাদের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। দশ বারোটি ছেলেমেয়ের নতুন গ্রুপটিকে উদ্দীপনার জোয়ারে টেনে নিয়ে যাবার মতোই অকৃত্রিম আগ্রহ তার। এ-সব ব্যাপারে ডুব দিলে আর ঘড়ির দিকে চোখ থাকে না বড়। নতুন গ্রুপ এলে এই সেবাব্রতে নিষ্ঠা আর একাগ্রতার ওপরেই সব থেকে বেশি জোর দেয়। বলে, রোগী ভালো করার প্রধান শর্ত, এ বার্নিং ডিজায়ার টু কিওর! এই জ্বলন্ত তৃষ্ণার নজিরও তারপর এসেই যায়। ডক্টর হাওয়ার্ডের গল্পও শোনাবেই।···মানসিক চিকিৎসা তখন এত দূর এগোয় নি। ডক্টর হাওয়ার্ড তখন সেই মানসিক চিকিৎসক যাঁর মাথায় রোগী ভালো করার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই। এই রোগীদের নাড়িনক্ষত্র জানা আর বোঝার জন্য রোগা ছিপছিপে মানুষটি দু'মাস তিনমাস করে এক এক রোগীর ঘরে রোগীর পাশে দিন কাটিয়েছেন, রাত কাটিয়েছেন। অদ্ভুত সুফলও পেয়েছেন তিনি, অনেক নতুন চিকিৎসার রাস্তা পেয়েছেন। এই করে তাঁর আশা আর আগ্রহ এত বেড়ে গেল যে এরপর এক ভয়াবহ ম্যানিয়াক-এর ঘরে বাস করবেন ঠিক করলেন। দিন কতক থেকেও ছিলেন, আর সেই রোগীকে কিছুটা বশও করেছিলেন। হঠাৎ রোগের প্রকোপে সেই ম্যানিয়াক ঘুমের মধ্যে গলা টিপে তাঁকে একেবারে শেষ করে দিলো। কিন্তু মানসিক চিকিৎসার জগতে অমর হয়ে রইলেন ডক্টর জ্যাক হাওয়ার্ড!

হ্যাঁ, চন্দ্রা নারায়ণ রাতের চিন্তা সকালের মধ্যেই ভুলেছে। ক'টা বাজল সে হুঁশও থাকে না।

ঘড়িতে তখন একটা কুড়ি। বাংলোর কোণের ঘরে জোসেফ মদন বিশ্বাস খাটে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছিল, চাপা অসহিষ্ণুতায় জিত্ ঘরে একবার পায়চারি করে নিয়ে বলল, তুই বলবি আমার মাথা খারাপ, কিন্তু

এতদিন দেখে শুনে আমার কি বিশ্বাস জানিস ? সে রকম দরকার হলে আর রোগী ভালো হবে বুঝলে ও তার বিছানায় রাতও কাটাতে পারে— বুঝলি ?

সিগারেট মুখে মদন বিশ্বাস নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ঠোঁটে হাসির আভাস, চোখে বিস্ময়মেশানো কৌতুক। বলল, তোর মাথাটা সত্যি গেছে। আরও জোর দিয়ে আরও অসহিষ্ণু গলায় জিত্‌ বলে উঠলো, আমি বলছি শুনে রাখ, ফর দি সেক্‌ অফ এ পেশেণ্ট, সী ক্যান শেয়ার হিজ বেড···রোগী ভালো হবে বুঝলে চন্দ্রা তাও পারে !

দরজার এ-ধারে চন্দ্রা নারায়ণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তার সমস্ত মুখ লাল। দু'জনের প্রতিটি কথা কানে গেছে। আস্তে আস্তে ঘরে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে ওরা দুজনেই চকচকিয়ে গেল একটু। চন্দ্রার অপলক চোখ জিতের মুখের ওপর। আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর স্পষ্ট কঠিন গলায় বলল, পারি !

এবারে জিতও সরোষে চেয়ে রইল তার দিকে। তেমনি তপ্ত কঠিন সুরে চন্দ্রা আবার বলল, দেখছ কি ? রোগীর জন্য দরকার হলে তাও পারি— এটা তুমি ভালো করে বুঝেছ তো ?

তার মুখের ওপর আর এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে চন্দ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

চন্দ্রার এ-ভাবে ঝলসে ওঠার কারণ আছে। অনেক দিন অনেক বরদাস্ত করেছে। এমন কুৎসিত ইঙ্গিত আগে কানে না শুনলেও এই লোকের ক্ষোভ অনেক দিন ধরেই টের পাচ্ছে। কাজে ডুব দিলে সময়ের জ্ঞান থাকে না চন্দ্রা সেটা অস্বীকার করে না। সময় সময় এজন্য নিজের ওপর বিরক্তও হয়। কিন্তু ঘরের লোক যেন এই অপরাধে এক নিঃশব্দ অসহ-যোগিতার মহড়া দিয়ে চলেছে। স্ত্রীর কাজের প্রতি যদি কখনো এতটুকু দরদের আভাস পেত, চন্দ্রা বর্তে যেত। সেটা একেবারেই দুর্লভ হয়ে উঠছে।

তাই যতক্ষণ কাজ ততক্ষণই যেন শান্তি চন্দ্রার। এই লোকের হাবভাব ক্রমেই ওর কাজে একটা বিঘ্নের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ এত ব্যস্ততার

মধ্যেও চন্দ্রা যেটুকু পারে করে যাচ্ছে—ছেলের দিকে চোখ আছে, স্বামীর প্রতি যত্নেও ত্রুটি করতে পারে না। লীলামাসি তো জামাইয়ের ভয়ে তটস্থ সর্বদা। মুখ ফুটে কিছু চাইতে হয় না। সব সামনে মজুত। তবু চন্দ্রার বাইরে যত নাম প্রতিপত্তি বাড়ছে, ঘরের এই লোক যেন ততো বেশি ওকে নিজের দখলের মধ্যে আগলে রাখতে চাইছে। বছর কয়েক আগেই ওই লোকের তাকে সংসারে আরো ভালো করে বেঁধে ফেলার মতলবের টের পেয়েছিল। চন্দ্রা নিজে সাবধান না হলে বাচ্চুর পরে সংসারে দু-তিনটি সমাগম হতে পারত। প্রত্যাশার মুহূর্তে চন্দ্রা যে তাকে বঞ্চিত করে এমন নয়, কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কে সে যথেষ্ট সতর্ক এবং সজাগ। আর সন্তান কাম্য নয় এটা সে তাকে মুখের ওপর স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছিল। তারপর থেকে দিনে দিনে ওই মানুষের রাগ আর ক্ষোভ বেড়েই চলেছে।

সেদিনের পরে আবার এক ঘটনায় চন্দ্রা নারায়ণ ক্ষিপ্ত, তিক্ত, বিরক্ত। রবিবার বিকেলে চেম্বার থাকে না, কিন্তু বাইরের দুই একটা দরকারী কল-এ বেরুতেই হয়। সে দিন ও সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে বেলা এগারোটার মধ্যে ফিরে এসেছে। ক'দিন হলো মদন বিশ্বাসের আবার দেখা নেই, খুব আশা করছে আজ আসবে। এলে রাতের খাওয়া-দাওয়ার আগে চন্দ্রা ওকে ছাড়বে না ভেবে রেখেছে। এই একজনও কিরকম হয়ে যাচ্ছে, হাসি খুশি কমছে, চোখ মুখ বসে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে দেখে বাংলোর সামনের দিকের সোফায় বসে জিত্ বই পড়ছে। উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, জোসেফ আসে নি ?

জিত্ বই নামালো। খুশি খুশি মুখ। জবাব দিলো, কই দেখছি না তো··· তোমার আজকের মতো শেষ ?

চন্দ্রা এবারে একটু ভালো করে লক্ষ্য করল তাকে। তারপরে হালকা টিপ্পনীর সুরে বলল, তবু ভালো।

—কি ? জিতের তেমনি খুশি ছোঁয়া প্রশ্ন।

—হাসি মুখ দেখলাম।

জিতও সরস অভিমানের সুরে জবাব দিলো, হাসি মুখ তুমি ইচ্ছে করলেই দেখতে পারো, ইচ্ছে করো না। শোন, আজ কিন্তু বিকেলের একটা

.প্রাগ্রাম ঠিক করে ফেলেছি, তোমার কোনো আপত্তি শুনব না।

—কি প্রোগ্রাম ? লোকটার মেজাজ দেখে চন্দ্রা সত্যিই উৎসুক একটু।

—ভালো একটা ইংরেজি ছবি এসেছে, তোমাতে আমাতে ইভনিং শোতে যাব—ফোনে টিকিট বুক করে রেখেছি।

চন্দ্রা হাসি মুখেই কাছে এগিয়ে গেল। তার সামনে টেবিলে এক ধারে ঠেস দিয়ে বসে ছদ্ম অবিশ্বাসের সুরে বলল, মেজাজের এত উন্নতি যে হঠাৎ, কি ব্যাপার ?

—তুমি যাবে কি যাবে না তাই বলো।

নিশ্চই যাব আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা! টেবিল থেকে সরে এলো, ছুটির দিনে লীলামাসি লাঞ্চের কি ব্যবস্থা করল দেখে আসি। ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়াল।—জোসেফটার আবার কি হলো বলো দেখি, ক'দিন দেখা নেই।

চিন্তিত মুখে জিত্ বলল, আজ না এলে কাল একবার যাব'খন খবর নিতে!

চন্দ্রা ভিতরে চলে গেল।

রাত ন'টায় সিনেমা ভাঙার পর জিতকে পাশে নিয়ে খুশি মনেই ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরেছে চন্দ্রা। জিত্ কিন্তু চুপচাপ এখন।

ফিরে দেখে কোণের ঘরে জোসেফ মদন বিশ্বাস চিৎপাত হয়ে হাঁ করে আর জিভ বার করে শুয়ে আছে—তার জামা তুলে চন্দ্রার স্টেথো কানে লাগিয়ে গম্ভীর মুখে বাচ্চু তার বুক পরীক্ষা করছে।

হাসি সামলে পিছন থেকে চন্দ্রা ডাকল, এই কি হচ্ছে ?

ছেলেটা ধড়ফড় করে উঠে কান থেকে স্টেথো খুলে ফেলল।

জামা নামিয়ে মদন বিশ্বাস উঠে বলল, বাচ্চুকেই জিজ্ঞাসা করল, কি রকম দেখলি, আশা-টাশা আছে কিছু ?

লজ্জা পেয়ে ছেলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভ্রূকুটি করে চন্দ্রা জোসেফের দিকে তাকালো।—আশা-টাশা আছে কিনা আয়নায় নিজের মুখখানা ভালো করে দেখলেই বুঝবে। কতক্ষণ এসেছ ?

—তোমরা সিনেমা দেখতে বেরুনোর একটু পরেই। সন্ধ্যা সাতটায় ডক্টর যাদব ফোন করেছিলেন—তুমি নেই শুনে রাগ করেই যেন ফোনটা ঝপ করে নামিয়ে রাখলেন।

—সে কি ! কেন কিছু বললেন না ?

মদন বিশ্বাসের মাথা নাড়ার মধ্যেই হঠাৎ তিক্ত স্বরে জিত্ তাকে বলে উঠলো, তুই কি এই খবরটা দেবার জন্যেই রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত বসে আছিস নাকি ?

মদন বিশ্বাস বা চন্দ্রা হঠাৎ তার এই মেজাজের কারণ ভেবে পেলো না। জিতের দিকে ফিরে চন্দ্রা কেবল বলল, একি !

তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জোসেফের শুকনো মুখ, তেলের অভাবে মাথার চুলগুলো খরখরে—হাসি হাসি চোখ দুটো জিতের মুখের ওপর। কিছু যেন মজার গন্ধ পেয়েছে সে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো।

ও-দিকের ঘরে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে চন্দ্রা স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। সমস্ত মুখ লাল, কঠিন। দু' ঘরের ভিতর দিয়ে আবার এ ঘরে এসে দাঁড়াল। সোজা জিতের দিকে তাকালো। জিত্ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

চন্দ্রা দুই এক পা এগিয়ে তার কাছে এলো। দেখছে। অনুচ্চ কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করল, সকাল সাড়ে দশটায় আমি যখন বাইরে ছিলাম, ডক্টর যাদব টেলিফোনে আমাকে কোনো দরকারী খবর দিতে বলেছিলেন ?

মানুষটা মনে করার ভান করছে। সিগারেট মুখে মদন বিশ্বাসের দু' চোখে কৌতুক।

আরো স্পষ্ট কঠিন সুরে চন্দ্রা আবার বলল, হেলথ্ অর্গ্যানিজেশন থেকে ডক্টর যাদবের বাড়িতে আজ সন্ধ্যা সাতটায় একটা স্পেশাল সিমপোসিয়াম অ্যারেঞ্জ করা হয়েছিল, আমি আসা মাত্র খবরটা তোমাকে দিতে বলেছিলেন ডক্টর যাদব ? আর রাতে ওখানে খেয়ে আসার নেমন্তন্নের কথাও বলেছিলেন ?

বিড় বিড় করে জবাব দিলো, হ্যাঁ···বলতে ভুলে গেছি।

চন্দ্রা চেয়েই আছে।—আমাকে বলতে ভুলে গিয়ে সিনেমায় যাওয়া ঠিক করলে ?···পাছে তোমার ভুলে যাওয়াটা আবার টেলিফোনে কেউ মাটি করে দেয়···এই জন্যে ?

জিতের অনেক দিনের রুদ্ধ তাপ হঠাৎ গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো যেন। বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ···সেই জন্যে ! ঘরের থেকে বাইরেটা তোমার বড় হয়ে উঠবে এ আমি···চাইনে···চাইনে !

পায়েব নিচে মাটি দুলছে চন্দ্রার। তবু প্রাণপণ চেষ্টায নিজেকে সংবরণ করল। বলল, ছি ছি, · এই তুমি ? এত হিংসে তোমার, কোথায় আনন্দে তোমার মন ভরে উঠবে, তার বদলে এই ? ছি ছি ছি ছি—

অস্ফুট হাসি কানে যেতে চন্দ্রা চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। হাসছে মদন বিশ্বাস। আর একটা সিগারেট ধরাল। চন্দ্রাকে দেখল। চন্দ্রা মদন বিশ্বাসকে দেখল। এই গোছের হাসি-গলা চাউনি চন্দ্রার চোখে কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো একটু।

মদন বিশ্বাস বলল, তোমাদের থেকে তাহলে আমি ঘরে বসে ঢের ভালো সিনেমা দেখে উঠলাম, অ্যাঁ ? ওয়াণ্ডারফুল ! ক্যারি অন্—

দেয়াল আলমারিব দিকে এগিয়ে গেল। ঘষা কাচের পাল্লাটা সরিয়ে আগের দিনের সেই ঘুমের ওষুধের ফাইলটা হাতে নিল। তার থেকে একটা নয়, দুটো ট্যাবলেট তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল।

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।—ও কি ? ও কি হচ্ছে ?

মদন বিশ্বাস হাসছে তখনো। ফাইলটা আলমারিতে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। —আমাকে দেখতে হবে না, আগে নিজের ঘর সামলাও ম্যাডাম, ঘর সামলাও !

হাসতে হাসতেই ঘর ছেড়ে চলে গেল সে। চন্দ্রা আত্মস্থ হতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারা গেল না। রাগে ক্ষোভে চোখ ফেটে জল আসছে। জ্বলন্ত চোখে আর একবার ঘরের লোকের মুখটা দেখে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মনের তলায় কি একটা অশুভ ছায়া নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এর সঙ্গে ঘরের

লোকের যোগ বেশি, কি জোসেফ মদন বিশ্বাসের সঙ্গে, চন্দ্রা ঠিক বুঝে উঠছে না। অবকাশ কম, তবু ভেবেছে। জিতের আচরণের সবটাই ঈর্ষা মনে হয়। নিজের মাথা স্ত্রী মাথার থেকে উঁচিয়ে তুলতে না পারলে অনেক পুরুষ অকারণে নিজে যেমন ভোগে, অন্যকেও তেমনি ভোগায়। স্ত্রীর যদি ধৈর্য আর সহ্যগুণ থাকে, এর থেকে বড় রকমের অঘটন কিছু ঘটতে পারে বলে তার মনে হয় না।

মানুষটা কোন্ ধাতুতে গড়া চন্দ্রার জানা আছে। ওকে নরম দেখলে সে গরম, আর গরম দেখলে গরম। তবু, একটু বাড়তি মর্যাদা দেবার জন্যই চন্দ্রা যতটা সম্ভব নরম হয়েই থাকে। এ-রকম একটা বিচ্ছিরি ঘটনার পরে ভিতরের রাগ আর বিতৃষ্ণা ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছে। নিজেকে নিয়ে কোনো পুরুষ অন্ধ না হলে স্ত্রীকে এমন বোকার মতো আক্কেল দিতে চায় না। জিত্ তো জানতই, এই রাতে না হোক, পরদিন সকালেই ধরা পড়তে হতো। টেলিফোনের কথা জোসেফ না বললেও পরদিন সকালে ডক্টর যাদবই বলতেন।

ঘরের দু'দিকে দুজনের দুটো পৃথক শয্যা। চন্দ্রা না হয় আর কেউ হলে সেই রাতে অন্তত তার অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকার কথা। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছে জিত্। চন্দ্রা গম্ভীর কিন্তু লক্ষ্য করছে।

উঠে এলো। জিতের খাটের পাশে বসল। এই রাতে অন্তত লোকটা স্ত্রীর এই ক্ষমা আশা করে নি। জিত্ ভাবল এক পশলা আগুন ঝরানো বোঝাপড়া হবে। কিন্তু আস্তে আস্তে এদিক ফিরতে সে-রকম মনে হলো না। দুজনেই গম্ভীর।

চন্দ্রাই প্রথম কথা বলল। বলল, দোষ তো করলে তুমি, মুখখানা অমন গোমড়া করে আছ কেন?

দোষ কতখানি আর কি-রকম বিচ্ছিরি, জিত্ সেটা না জানে এমন নয়। তাই এ-রকম আপোস দু'চারদিনের মধ্যেও হতে পারে আশা করে নি। কিন্তু একই সঙ্গে আত্মাভিমানও একেবারে বিসর্জন দেয় কি করে।

আর একটু ঝুঁকে চন্দ্রা বলল, একদিকে তুমি এ-রকম অবুঝপনা করেই চলেছ, অন্যদিকে জোসেফটাও দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে, আমি

কোন্ দিক দেখি বলো তো ?

এবারে জিত্ জবাব দিলো, আমাকে ছাড়া আর সব দিকই দেখো।

রাগ নয়, রাগের ভান করল চন্দ্রা।—তোমাকে আর কি রকম করে দেখতে হবে ? চাকরি ছাড়ব ?

জিত্ জবাব দিল না। চেয়ে আছে।

—প্রাকটিস ছাড়ব ?

—আমি তোমাকে কিছু ছাড়তে বলেছি ?

—কিন্তু যা করলে আজ, সে-তো বলার থেকেও বেশি !

...সব পুরুষ এমনি নির্লজ্জ এমনি বেহায়া কি না চন্দ্রা জানে না। এ রকম কথার পরেও অনুতাপ কতটুকু দেখল ঠাওর করতে পারল না। যা দেখল তার নাম লোভ ছাড়া আর কিছু না। দু'চোখে লোভ চিকিয়ে উঠেছে। দুটো হাত ওর কাঁধের ওপর উঠে এসেছে।

ঈর্ষার ডোবা থেকে টেনে তোলার জন্য এই লোভের প্রশ্রয় দিতেও স্ত্রীটির খুব একটা আপত্তি হবে না সেটা যেন জিত্ও বুঝতে পারছে।

পরদিন বিকেলের চেম্বার শেষ হতে চন্দ্রাই এসে প্রস্তাব দিলো, চলো বেড়িয়ে আসি। ছেলেকে পাঁচ আঙুল দেখালো।—পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি হলে তুমি থাকবে।

বাচ্চু আনন্দে লাফাতে লাফাতে তার লীলামাসির সন্ধানে গেল। খুশি খুশি মুখে জিত্ জিজ্ঞাসা করল, আজ বাইরের কল নেই বুঝি ?

—ছিল। বাতিল করেছি।

ছোট গাড়িতে সামনে তিনজনের জায়গা হয় না। চন্দ্রা ড্রাইভ করছে, পাশে জিত্। পিছনে বাচ্চু একা। গাড়ি যে রাস্তায় ছুটেছে সেটা খুব চেনা বলেই জিত্ জিজ্ঞাসা করল, এদিকে যে ?

সামনের দিকে চোখ রেখে চন্দ্রা জবাব দিলো, জোসেফকেও তুলে নিই।

খুশি হয়ে পিছন থেকে বাচ্চু বলে উঠলো, জোসেফ কাকু তাহলে আমার সঙ্গে পিছনে বসবে বাবা ?

জিত্ চন্দ্রার দিকে তাকালো একবার। তারপর জবাব দিলো, পিছনে

বসবে কি সামনে বসবে সেটা তোর মাকে জিগেস কর।

রিয়ার গ্লাসের ছোট আয়নায় পিছন থেকে মায়ের মুখটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছে বাচ্চু। বাবার কথায় তার ঠোঁটের ফাঁকে টিপটিপ হাসি কেন সেটা তার কাছে দুর্বোধ্য।

নিজের পৈতৃক বাড়ি বেচে মহানগরে একটা মাঝারি আকারের একতলা বাংলো ভাড়া নিয়ে আছে জোসেফ মদন বিশ্বাস। এখানেও নিজের মনের মতো স্টুডিও সাজিয়েছিল। যেন দিন-রাত শুধু কাজ ছাড়া আর তার কিছু করার নেই। কিন্তু কাজ যে কত করছে তা চন্দ্রাই জানে। আজও দূর থেকে দেখা গেল স্টুডিওর জানালা দরজা সব বন্ধ। বারান্দায় আধবয়সী ভিখু দাঁড়িয়ে। মদন বিশ্বাসের অনেক দিনের পুরনো কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।

গাড়িটা থামতে ভিখু শশব্যস্তে বারান্দা থেকে নেমে এলো। চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

ভিখু হাঁ।—দাদাবাবু? তার তো কাল রাত থেকেই পাত্তা নেই! বলল, ও ভেবে বসে আছে তার দাদাবাবু চন্দ্রা দিদিমণির ওখানেই থেকে গেছে।

এ-রকম খবর চন্দ্রা বা জিত্ কেউ আশা করে নি। বিমূঢ় চন্দ্রা জিতের দিকে তাকালো। কাল রাতে কড়া দুটো ঘুমের ট্যাবলেট নিয়ে বেরিয়ে গেল, তারপর আজ বিকেল পর্যন্ত দেখা নেই, কি হতে পারে?

কি হতে পারে সেটা জিতেরও মাথায় আসছে না। চন্দ্রা ফিরে আবার ভিখুকেই বলল, তোমার দাদাবাবু আমাদের বাড়িতে ছিল না, রাত সাড়ে ন'টার পরে বেরিয়ে এসেছে,...আচ্ছা, এখানে আর কোথাও যায়-টায় কিনা তুমি জানো?

ভিখু মাথা নাড়ল। বলল, এখানে একমাত্র তোমাদের বাড়ি ছাড়া দাদাবাবু আর তো কোথাও যায় না।

ফেরার আগে চন্দ্রা দু-তিনবার করে ভিখুকে বলে দিলো, তার দাদাবাবু এলেই সে যেন আধ-ঘন্টার ছুটি নিয়ে তাদের বাড়িতে অবশ্য একটা খবর দিয়ে আসে।

কিন্তু তারপর পাঁচ ছ'দিন কেটে গেল, কোনো খবরও নেই, ভিখুরও দেখা

নেই। জিতের ধারণা, সেই রাতেই মদন বিশ্বাস আবার কোথাও চলে গেছে, হয়তো দু'মাস বা তিন মাস বাদে আবার হুট করে একদিন এসে হাজির হবে।

চন্দ্রাও তাই ভাবছে। কিন্তু ভিতর থেকে কেন যেন খুব একটা সায় পাচ্ছে না। এখান থেকে যাবার সময়ে পরনে শুধু ট্রাউজার আর একটা শার্ট ছিল। পকেটে টাকা কেমন ছিল তা অবশ্য জানে না। খেয়ালের বশে এক সময় লম্বা গা-ঢাকা দেয় সত্যি, কিন্তু এ রকম একবস্ত্রে কক্ষনো বেরিয়ে পড়ে না। আর বেরোয় যখন ভিখুকে অন্তত জানান দিয়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে, জিত্‌কে নিয়ে নয়, ভিতরের অশুভ ছায়াটা এই জোসেফকে নিয়েই। চন্দ্রার অভ্যস্ত চোখে মানসিক বৈষম্যের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোও ধরা পড়ে। জোসেফের চালচলনে ইদানীং অনেক সময় খটকা লেগেছে। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার যে ক্লান্তি সেই গোছের একটা ক্লান্তি ওর চোখে মুখে ফুটে উঠছে। কিন্তু অসহিষ্ণু তাড়নায় সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা। নাকচ করে ফুর্তির জোয়ারে ভেসে থাকার চেষ্টা। এ রকমটা আগেও দেখেছে। কিন্তু ইদানীং ও যেন চেষ্টা করেও এই হৈ-চৈ ফুর্তির দিকটা আর জোরালো করে তুলতে পারছে না।

মনের কথা মুখে কখনও প্রকাশ করে নি চন্দ্রা। জিতকেও বলে নি। সময় আর সুযোগ পেলে জোসেফকেই হয়তো বলতো। সে রকম সুযোগ বা সুবিধে ওই লোকটাই কখনো দেয় নি।

কিন্তু পরের দু'দিনের মধ্যে যে পরিস্থিতির সূত্রপাত, আচমকা এ-রকম একটা ধাক্কা খাবার জন্য প্রস্তুত ছিল না চন্দ্রা নারায়ণও।

হাসপাতালের রাউণ্ড সারছিল। সকাল তখন সাড়ে ন'টা হবে। হন্তদন্ত হয়ে একজন নার্স ছুটে এসে কি খবর দিলো ওকে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাও একটু ব্যস্ত হয়ে ফিরল। করিডোর ধরে সোজা নিজের আপিস ঘরে চলে এলো।

আপিস ঘরে তার টেবিলের সামনের চেয়ারে গা ছেড়ে বসে চুরোট টানছেন প্রফেসর মহেশ্বর যাদব। কিছুদিন আগেও এই হাসপাতালের সর্বাধিনায়ক ছিলেন তিনি। বয়েসের দরুন সম্প্রতি হাসপাতালের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন।

—স্যার কি ব্যাপার, আপনি নিজে এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন ?

ডক্টর যাদব হাসি মুখে নড়েচড়ে সোজা হলেন একটু। ঠাট্টা করলেন, কেন আমি কি একেবারে অথর্ব হয়ে গেছি —এই বয়সেও তোমার হাজ্ ব্যাণ্ডকে হিংসে করি আমি জানো ?

ভদ্রলোক যেমন গুণী জিভের লাগামও তেমনি ঢিলে। বাড়িতে কতদিন জিতকেই এ কথা বলেছেন। নিজের চেয়ারে মুখোমুখি বসে হাসি মুখেই চন্দ্রা জিগ্যেস করল, বলুন স্যার—

—ভেরি বিজ্ ই ?

—না, আপনি এসেছেন শুনেই আজকের মতো রাউণ্ড শেষ করে চলে এলাম।

ডক্টর যাদব মুখ থেকে চুরোটটা হাতে নিলেন। ওটা নিভেও গেছে। বললেন, তোমার সঙ্গে কিছু ইম্পরট্যান্ট আলোচনা আছে আই ওয়াণ্ট নোবডি টু ডিসটার্ব আস নাও।

চন্দ্রা বেল বাজাতে গিয়েও বাজালো না। উঠে বাইরে গিয়ে বেয়ারাকে বলে এলো কাউকে যেন এখন ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়। নিজের চেয়ারে বসল।...বলুন স্যার।

নেভানো চুরোটটা আবার ধরিয়ে নিয়ে ডক্টর যাদব জিজ্ঞাসা করলেন, জোসেফ মদন বিশ্বাসকে তুমি কতদিন চেনো বা কি রকম চেনো ?

চন্দ্রা আঁতকে উঠলো। জবাব দেবার কথা মনে থাকল না।—কেন স্যার? তার কি হয়েছে ? সে কোথায় এখন ?

ডক্টর যাদব ভুরু কোঁচকালেন।—এখানেই তো, তোমার সঙ্গে শিগগীর দেখা হয় নি ?

—না! সাত আট দিন আগে রাত্রিতে আমার আলমারি থেকে দুটো স্লিপিং ট্যাবলেট নিয়ে চলে গেল। পরদিন বিকেলে তার বাড়ি গিয়ে শুনি রাতে ফেরেই নি। ওর লোককে বলে এসেছিলাম ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যেন খবর দেয়। খবর না পেয়ে ভাবলাম খেয়ালের মাথায় আবার কোথাও চলে গেছে—

ডক্টর যাদব তাকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, খেয়ালের মাথায় আগেও এ রকম চলে গেছে ?

—অনেকবার। বলতে গেলে দশ বছর ধরেই এ রকম দেখছি। বলা নেই কওয়া নেই বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ওর কি হয়েছে স্যার ?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডক্টর যাদব জবাব দিলেন, যা হলে লোকে আমাদের দরজায় আসে তাই—আপাতত সে আমার পেশেণ্ট।

—আপনার পেশেণ্ট! · কবে থেকে ? কি দেখলেন ?

ডক্টর যাদব বললেন, এর মধ্যে দু'দিন আমার কাছে এসেছে। প্রথম এসেছিল চারদিন আগে, তারপর গতকাল। ··কাল আরো খারাপ দেখলাম। আই থিংক ইটস্ অবসেসিভ নিওরসিস উইথ ডিপরুটেড ইমোশন্যাল ফ্যাক্টরস। তুমি ওকে কতদিন চেনো ?

—প্রায় পনেরো বছর। জিতের ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিল।

--ডিড্ ইউ সি হিম অলরাইট অল্ দি টাইম ?

—না স্যার—বছর এগারো আগে ও একবার ব্লেড দিয়ে নিজের গলা কাটতে চেষ্টা করেছিল, আর একটু হলেই ট্রেকিয়া টাচ করে যেত।

—হুঁ···তারপর ?

চন্দ্রা জবাব দিল, তারপর এত বছরের মধ্যে ও-রকম ইমোশন্যাল ক্রাইসিস অবশ্য আর দেখি নি—তবে দিনকে দিন বেশি হুইম্জিক্যাল হয়ে পড়ছে লক্ষ্য করেছি। ইদানিং ওর হাবভাব আমার কেন যেন স্বাভাবিক লাগছিল না। এবারে ঘুমের ওষুধ খাওয়াও আরো গেছে দেখলাম।

একটু ভেবে নিয়ে ডক্টর যাদব আবার জিগেস করলেন, গলায় যখন ব্লেড বসিয়েছিল সে সময়ের ইমোশন্যাল ডিস্টারব্যান্সের কারণ কিছু আঁচ করতে পেরেছিলে ?

একটু ইতস্তত করেও চন্দ্রা মাথা নাড়ল। পেরেছিল।

চন্দ্রার মুখের দিকে চেয়েই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মানুষটি যা বোঝার বুঝে নিলেন। মুখটা সামান্য বিকৃত করে বলে উঠলেন, দ্যাট ওল্ড স্টোরি অফ লাস্ট ব্যাট্ল ইন লাভ দেন···।

চন্দ্রা নিরুত্তর কিন্তু চিন্তাচ্ছন্ন।

ডক্টর যাদব আবার নিভে যাওয়া চুরোটটা আরো এক দফা জ্বেলে নিলেন।

—সেই মেয়েটিকে তুমি জানতে ?

চন্দ্রা মাথা নাড়ল। জানতাম।

—সেখান থেকে বড় রকমের অপমান বা আঘাত-টাঘাতের ব্যাপার কিছু ঘটেছে ?

চন্দ্রা একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলো, যতদূর জানি সে রকম কিছু হয়নি ··· জোসেফ অবশ্য অনেক সময় ইয়ারকি করে বলে রাম থাপ্পড় খেয়েছে··· কিন্তু আমাদের ধারণা সেই মেয়ের কাছে কখনো সে ভালো করে নিজেকে প্রকাশই করে নি।···মেয়েটিং অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে সেটাই হয়তো ওর কাছে থাপ্পড় খাওয়ার মতো।

ডক্টর যাদব চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিলেন এক দফা। তারপর চন্দ্রার পাশ ঘেঁষে টেবিলের ওপরেই বসলেন

এবারে উনি যা বললেন শুনে চন্দ্রার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। আগে থাকতে ফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে জোসেফ তাঁর সঙ্গে চার দিন আগে দেখা করেছে। আর প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছে ডক্টর যাদব তাকে চেনেন কি না। ডক্টর যাদব দেখেই চিনেছেন। চন্দ্রাদের বাড়িতে অনেকবার দেখেছেন। পরিচয়ও হয়েছিল। জোসেফ সিগারেট বেশি খায়, তখনো মুখে সিগারেট। উনি তাকে বসতে বলে জিগেস করলেন, পেশেণ্ট কে ?

জোসেফ বলল, আমি।

রাশভারী ডক্টর যাদব তখন ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে চিনলে কি সুবিধে আর না চিনলেই বা কি অসুবিধে ?

জোসেফ মদন বিশ্বাস লোকটা যে কত বুদ্ধিমান তার পরেই বুঝে নিলেন ডক্টর যাদব। মুখের দিকে থমকে চেয়ে জোসেফ প্রশ্নটা বুঝতে চেষ্টা করল। পকেট থেকে নিজের পার্সটা টেনে নিয়ে গুনে পাঁচখানা দশ টাকার নোট অর্থাৎ পঞ্চাশটা টাকা তার সামনে টেবিলে রেখে পেপার ওয়েট চাপা দিলো। বলল, টেলিফোনে আপনার ক্লার্কের কাছে জেনে নিয়েছিলাম চেম্বারে আপনার ফী পঞ্চাশ টাকা। এবারে বলুন, আপনি আমাকে চেনেন কিনা ?

এবারে নিরীহ মুখে ডক্টর যাদব মাথা নেড়েছিলেন। চেনেন।

জোসেফ তখন জানালো, সে কিছু মানসিক গোলযোগে ভুগছে, মাথায় মাঝে মাঝে খুব যন্ত্রণা হয়, আর সব থেকে বড় ট্রাবল্ রাতে ঘুম হয় না। সে অনেকটা নিরুপায় হয়ে ডক্টর যাদবের কাছে এসেছে, কিন্তু চিকিৎসার প্রথম শর্ত, ডক্টর যাদব এটা কক্ষনো দ্বিতীয় কাউকে জানাবেন না, চন্দ্রা নারায়ণকে না, জিত্ নারায়ণকে না, কাউকে না !

ডক্টর যাদব অম্লান বদনে শর্ত মেনে নিলেন। কেউ জানবে না বলতে যে ওরা দুজন সেটা তিনি বুঝে নিয়েছেন। মিনিট কুড়ি ছিল প্রথম দিন। ডক্টর যাদব যতটা সম্ভব পরীক্ষা করে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে কি কি কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তখনকার মতো ওষুধও দিয়েছেন। বেশির ভাগ সিডেটিভ আর ঘুমের ওষুধ। তাঁর কথা মতো আবার গতকাল সে এসেছিল ! প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছে তার অসুখের খবর চন্দ্রা বা জিত্ নারায়ণ জানে কিনা।

ডক্টর যাদব তাকে পাল্টা ধমকের সুরে জবাব দিয়েছেন, এ লাইনের ডাক্তারদের কাছে যার যার রোগীর প্রসঙ্গ টপ সিক্রেট ব্যাপার।

আশ্বস্ত হয়ে মদন বিশ্বাস আগের দিনের মতোই পঞ্চাশটা টাকা টেবিলে রেখেছে। খাতির দেখালে সন্দেহ বাড়বে ধরে নিয়েই ডক্টর যাদব আপত্তি করেন নি। কিন্তু এই দিনে উনি আরও বেশি চিন্তিত হয়েছেন। একটুও উপকার হয় নি শুনে ওষুধ ঠিক মতো খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে রোগী জবাব দিয়েছে, ওখুধ খেয়েছে কিন্তু ঠিক মতো কিনা মনে পড়ছে না। মাথায় তেমনি যন্ত্রণা, ঘুমও ভালো হয় নি। তারপর যা বলল, সেটাই বেশি দুশ্চিন্তার কারণ। পর পর দু'দিন একই স্বপ্ন দেখেছে মদন বিশ্বাস, খুব গভীর ঘুমের মধ্যে নয়—আধা ঘুমের মধ্যে যেন। দেখেছে, একটা বিশাল বীভৎস সাপ ওকে পায়ের কাছ থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে আসছে—ওমনি পাকে পাকে জড়িয়ে শেষে মাথার ওপরে ফণা তুলে ধরেছে। হিংস্র, ভয়ঙ্কর। শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় গলা আটকে দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। কিন্তু তারপর যা হলো তা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! । গলার নিচে পর্যন্ত সেই বিকট সাপই জড়িয়ে আছে

কিন্তু সাপের মাথাটা আস্তে আস্তে বদলে গিয়ে জোসেফের আর একটা মাথা হয়ে যাচ্ছে। আর একটা মাথা, আর একটা মুখ, আর দুটো জ্বলন্ত চোখ। জোসেফেরই মাথা মুখ চোখ বটে, কিন্তু ওই সাপের মতোই হিংস্র আর ভয়ঙ্কর। সমস্ত রাগ আর হিংসা যেন এই জোসেফের ওপর।

এ পর্যন্ত শুনে চন্দ্রাও বিচলিত। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, অটো সাজেশান অফ ভেনজেন্স অন্ সেলফ্ সার!

টেবিল থেকে নেমে আর একবার চক্কর খেতে খেতে ডক্টর যাদব বললেন, রাইট। খুব ডীপ রুটেড ফ্যাক্টর ছাড়া আত্ম ধ্বংসের এরকম সাজেস্টিভ স্বপ্ন দেখার কথা সচরাচর শোনা যায় না।

ঘুরে আবার আগের চেয়ারে মুখোমুখি বসে বললেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নিজের ওপর ভয়ঙ্কর রকমের রাগ-টাগ বা সেই গোছের কিছু হয় কিনা—তোমাদের বন্ধু অকপটে স্বীকার করল, হঠাৎ হঠাৎ সাংঘাতিক রাগ হয় আর নিজেকে তখন খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

তক্ষুনি আরও কিছু মনে পড়ল চন্দ্রার। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ আরও বাড়ল। বলল, ওর কাছে একটা রিভলভার আছে স্যার—

ডক্টর যাদব তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রীর অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা ঠিকই আঁচ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন যাবত আছে?

তা অনেককাল অবশ্য, আমি ঠিক জানতাম না, কিছুদিন আগে দেখলাম। তার বাবার আমল থেকে আছে ওটা।

আশ্বাসের সুরে ডক্টর যাদব বললেন, যাক, তুমি অত ভেবো না, রিভলভারের থেকে রোগটা বড় সমস্যা, সে ক্রাইসিস এলে রোগী হিসেব করে কিছু করে না, নইলে রিভলভার থাকতে গলায় ব্লেড বসাতে যাবে কেন? তবু ওসব জিনিস হাতের কাছে না থাকাই ভালো ছিল···।

জোসেফ মদন বিশ্বাস সম্পর্কে আচমকা এমন একটা খবর পেয়ে চন্দ্রা ধড়ফড় করে উঠেছিল। কিন্তু এ লাইনের ডাক্তার হিসেবে তারও স্নায়ু যথেষ্ট সবল। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে ভেবে নিল একটু। নিষেধ সত্ত্বেও প্রোফেসার যাদব সবার আগে তাকেই সব জানালেন কেন, তাও আঁচ করতে পারে। জিজ্ঞেস করল, তাহলে এখন আমরা কি ভাবে এগোব স্যার,

নিওরটিক পেশেণ্ট ট্রিটমেণ্টের সঙ্গে অ্যানালাসস চললে বেশি রেসপণ্ড করে···কিন্তু আপনি তো এদিকটা আর করেন না।
ডক্টর যাদব মাথা নাড়লেন, এ জন্যেই তোমাকে বলা, হি রিকোয়ারস্ বোথ্। ট্রিটমেণ্ট না হয় তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে আমিই করে যাব— কিন্তু অ্যানালিসিসের দিকটা কি হবে ?
ফয়সলা যেন হয়েই গেছে এমনি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। —আপনি ভাববেন না সার, এদিকটা আমি ম্যানেজ করব।

চন্দ্রার বেবী অস্টিন মদন বিশ্বাসের বাড়িরদিকে ছুটেছে। প্রোফেসারকে বলে এলো, ম্যানেজ করবে, কিন্তু কিভাবে করবে নিজেও জানে না। স্টুডিও ঘরের জানালা দরজা খোলা দেখে একটু স্বস্তিবোধ করল। কাজে একটু আধটু মন থাকলেও সেটা ভালো লক্ষণ।
প্রায় নিঃশব্দে সেই ঘরে এসে দাঁড়াল। দরজা জানালা খোলা বটে, কিন্তু মানুষটা ঘরে নেই। চন্দ্রা স্টুডিও ঘরের চারদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল। ভিতরের হাল দেখে মুখে আবার দুশ্চিন্তার ছায়া। ক্যামেরা, স্পুল টুকিটাকি সরঞ্জাম ঘরময় ছড়ানো। আর একরাশ পোড়া সিগারেটের টুকরো। ঘরটায় ক'দিনের মধ্যে হয়তো ঝাঁট পর্যন্ত পড়ে নি এমন ধূলো জমে আছে।···কত উৎসাহ নিয়ে ক'বছর আগে এই নতুন স্টুডিওর ঘর সাজিয়েছিল লোকটা, চন্দ্রার মনে আছে।
পায়ে পায়ে ভিতরের বড় ঘরটায় এসে দাঁড়াতেই ভিখু কোথা থেকে তাকে দেখে ছুটে এলো। সঙ্গে সঙ্গে হাঁউ মাউ কান্না।—দাদাবাবুর কি হলো গো দিদিমণি, কাল রাতে তার হাতে এই বয়সে আমাকে মার পর্যন্ত খেতে হলো, এক পেল্লায় চড় খেয়ে ওইখেনে মুখ থুবড়ে পড়লাম—
আপনা থেকেই চন্দ্রার দুই ভুরু কুঁচকে গেল একটু। জোসেফ কাছাকাছির মধ্যে থাকলে ভিখুর এভাবে কান্নাকাটি করে নালিশ জানানোর কথা নয়। তাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, তোমার দাদাবাবু কোথায় ?
শুনল ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছে। কোথায় ভিখুর তা জানা নেই। এর পর এ ক'দিনের মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে চন্দ্রা ঠাণ্ডা মাথায় শুনে

নিল।…সেই সেদিন সন্ধ্যায় চন্দ্রারা চলে যাবার দু' তিন ঘণ্টা পরে জোসেফ বাড়ি ফিরেছে, চব্বিশটা ঘণ্টা কোথায় ছিল ভিখু জিগেস করবে কি, মূর্তি দেখেই ভয় ধরেছে। এর আগে থেকেই তো কত দিন ধরে সময়ে খাওয়া নেই। আর সেই দিন কি বিচ্ছিরি চেহারা, এক গাল দাড়ি, চোখ দুটো গর্তে, মাথার চুলে জট্ ধরেছে, পরনের জামা-প্যাণ্টও তেমনি ময়লা। বিকেলে জিত্‌বাবু আর খোকনকে নিয়ে চন্দ্রা দিদিমণি এসেছিল শুনে কিচ্ছু বলল না। কিন্তু দাদাবাবু এলেই চন্দ্রা দিদিমণি ওকে একটা খবর দিতে বলেছিল শুনেই যেন ক্ষেপে গেল। বলল, খবর দিতে হবে না, বাড়িথেকে এক পা বেরোলে ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে। এরপর ভিখু আর যায় কি করে। তারপর এ ক'দিনের মধ্যে খাওয়া দাওয়া এক রকম নেই বললেই চলে, কেবল ওষুধ গিলছে আর সিগারেট টানছে– এত সিগারেট খেতেও ভিখু বাপের জন্মে আর কাউকে দেখে নি। আর কত দিন হয়ে গেল চোখ থেকে ঘুমও উবে গেছে—রাতে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার বেশি ঘুমোয় বলে মনে হয় না—সমস্ত রাত সিগারেট খায় আর পায়চারি করে। গত কাল দিনের বেলায় পেটে কিছু পড়েইনি বলতে গেলে, খেতে বসেছে আর উঠে গেছে, রাতের খাবার জন্য ডাকাডাকি করতে বলে দিলো খাবে না! তখন ভিখুরও অসহ্য হয়ে উঠেছে, সেও রাগ করে বলেছে, এক্ষুনি ও চন্দ্রা দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে—

তাই শুনে কাছে এসে বলা নেই কওয়া নেই ঠাস করে গালে এক চড়। সে কি চড় গো দিদিমণি, আমি ছিটকে পড়ে গেলাম!

চন্দ্রা দ্রুত ভেবে নিল একটু। প্রোফেসারের কাছেও রোগের ব্যাপারটা ওর কাছে গোপন রাখার তাগিদ। ভিখুকে মারার কারণও তাই। এর একটাই হেতু মনে এলো। চন্দ্রার কাছে ধরা পড়লে তার নিজের চেষ্টার সব বাঁধ ভাঙবে ভাবছে। ওর যন্ত্রণার মূল কারণ জানে বলেই তাকে গোপন করা। ধরা পড়লে বা গোপনতা ফাঁস হলে যে উল্টো ব্যাপার হবে, অনেক বড় অবলম্বন পাবে—এ ধরনের রোগী গোড়ায় সেটা বুঝতে চায় না, বুঝতে পারেও না!

এবারে চন্দ্রা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতোই গম্ভীর। বলল, তোমার দাদাবাবু

যে বেশ একটা অসুখ বাধিয়ে বসেছে, এটা তুমি বুঝতে পারো ?

ভিখু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

—তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ভিখু। কিন্তু তোমার দাদাবাবু যেন জানতে না পারে, জানলে ভীষণ ক্ষতি হবে।

ভিখু জবাব দিলো, দাদাবাবুকে কিচ্ছু বলবে না বা জানতে দেবে না।

—ঠিক ? তোমাকে বিশ্বাস করছি কিন্তু।

—আমি তোমার অবিশ্বাসের কাজ করব দিদিমণি, দাদাবাবুর যেখানে ভালো হবে!

—তোমার দাদাবাবুর একটা রিভলভার আছে···জানো ?

এ রকম কথা আশা করে নি ভিখু। রিভলভার শুনেই একটা অজানা ভয়। মাথা নাড়ল, জানে।

—সেটা কোথায় থাকে ?

কথা না বলে ভিখু তাকে তার দাদাবাবুর শোবার ঘরে নিয়ে এলো। দেয়ালের দিকের কাঠের আলমারিটা দেখিয়ে বলল, ওটার দেরাজের মধ্যে।

—চাবি কোথায় ?

—দাদাবাবুর কাছেই।

চন্দ্রা বলল, ওটা ওখান থেকে সরানো দরকার ভিখু···তোমার দাদাবাবুকে না জানিয়ে চাবিটা আমাকে দিতে পারো ?

বলামাত্র ভিখুর চোখে মুখে ত্রাস। আতঙ্কগ্রস্তের মতো ফিসফিস করে বলল, আমি তো ওই সব্বনেশে জিনিসটার কথা ভুলেই গেছি দিদিমণি—যে দাদাবাবু হেসে ছাড়া আমার সঙ্গে কথা কইত না সে অমন একখানা চড় মেরে বসল, এরপর কবে গুলি করে আমার মাথার খুলি উড়িরে দেবে তার ঠিক কি ? গুলি ভরাই থাকে কিনা কে জানে—ওটা তুমি শিগগীর সরাও ওখান থেকে, চাবি তোমাকে আমি ফাঁক মতো ঠিক যোগাড় করে দেবো, আলমারির চাবি তো যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। তুমি আবার কবে আসছ ?

—আজই বিকেলে। চেম্বার সেরে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব। আমি

এসেছিলাম দাদাবাবুকে জানাবে আর বলবে বিকেলে যেন বাড়ি থাকে, আমার খুব দরকার।

বিকেল সাড়ে ছ'টার মধ্যে চন্দ্রার বেবি অস্টিন আবার মদন বিশ্বাসের বাড়ির দোর গোড়ায়। না, আজ আর জিত্ বা ছেলেকে সঙ্গে আনে নি। একাই এসেছে। গাড়ি থেকে নামার আগেই ভিখু ছুটে এলো। চাপা উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, দাদাবাবু সবে বাথরুমে চানে ঢুকেছে, সময় লাগবে একটু, চাবি তার ঘরে, যা করার এক্ষুনি করে ফেলো!

কোনো কথা না বলে চন্দ্রা তার পিছনে উঠে এলো। সোজা শোবার ঘরে। আলমারির চাবি বিছানার ওপরেই পড়ে আছে। ভিখু তাড়াতাড়ি সেটা ওর হাতে দিয়ে দরজার কাছে পাহারায় দাঁড়াল। এক্ষুনি চানের ঘর থেকে বেরুবে না জানে, তবু সাবধানের মার নেই।

চন্দ্রা নিঃশব্দে আলমারি খুলল। আলমারির মধ্যে দুটো খুপরি দেরাজ। সে দুটোর চাবিও ঠিক করে নিতে দেরি হলো না। ডানদিকের দেরাজে টাকা পয়সা আর সম্ভবত কিছু দরকারি কাগজপত্র। সেটা বন্ধ করে চন্দ্রা বাঁয়ের দেরাজ খুলল। সেটাতে শুধু রিভলভারটা ছাড়া আর কিছু নেই।

একটু স্বস্তি বোধ করল চন্দ্রা। শুধু রিভলভারের খোঁজ পড়লেই এই বাঁয়ের দেরাজ খোলা হবে, অন্য কারণে এটা খোলার সম্ভাবনা নেই। শিগগীর হয় তো জানতেও পারবে না। আর খোঁজ পড়লে তো বিপদের কথাই, তখন যাতে না পায় সেই জন্যেই সরানো।

রিভলভারটা তুলে নিয়ে চন্দ্রা নিঃশব্দে প্রথমে দেরাজ দুটো বন্ধ করল, তারপর আলমারির দরজা। কিন্তু কোথায় রাখা যায় এটা। পলকের মধ্যে ঘরের চারদিক দেখে নিল।

ব্যস্ত হয়ে ভিখু এগিয়ে এলো।—দেখছ কি, চট করে তোমার গাড়িতে রেখে এসো, তারপর যাবার সময় তোমার বাড়ি নিয়ে চলে যাও!

চন্দ্রা তখনও জায়গা খুঁজছে। বলল, এ জিনিস অন্য বাড়িতে সরানো খুব বিপদ, কেউ জানতে পেলে আমার জেল হয়ে যাবে। এই ঘরের কোথাও রাখতে পারলেই সব থেকে ভালো হয়।

শুনে দিশেহারার মতো ঘরের চারদিকে জায়গা খুঁজতে লাগল ভিখুও।

শয্যালগ্ন বইয়ের ছোট আলমারিটার দিকে চোখ গেল চন্দ্রার। সেই কাচের আলমারির মাথায় একটা বেতের ভাস, তাতে রঙিন প্লাস্টিকের ফুলের গোছা বসানো। মদন বিশ্বাস এই বাড়ি নেওয়া পর্যন্ত চন্দ্রা ওই ভাস আর ফুলের গোছা ওখানে ওই রকমই দেখে আসছে। ওটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার দাদাবাবু ওটাতে কখনো হাত দেয় না তো?

ভিখু মাথা ঝাঁকালো।—না, কখনো-সখনো আমি ওই ফুল সাবান জলে পরিষ্কার করি।

—আর এটা তুমি ছোঁবেপ না। বলতে বলতে চোখের পলকে চন্দ্রার কাজ শেষ। ফুলসহ বেতের ভাস আবার যথাস্থানে।

বাইরে এসে দুজনেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। চন্দ্রা তবু ভিখুকে আর এক দফা সাবধান করল, কখনো রিভলভার না পেয়ে তোমাকে যদি মারতেও আসে—তাহলেও কিন্তু বোলো না কিছু জানো—যে-ভাবে হোক তখন শুধু আমাকে খবব দেবে।

ভিখু ঠাকুর দেবতার নাম করে দিব্বি কাটল, মরে গেলেও কাউকে কিছু বলবে না।

ও ছুটে গিয়ে আর একবার স্নানঘর দেখে এলো। বলল, এখনো ঝপঝপ করে জলই ঢালছে, আর সকাল-বিকেল যে কত চান হচ্ছে ঠিক নেই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চন্দ্রা স্টুডিওর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভিতরে চোখ যেতে অবাক। তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে চারদিক দেখে নিল। এক বেলার মধ্যে ঘরের ভোল্ পাল্টে গেছে। সিগারেটের টুকরো নেই, ধুলোবালি নেই। আগের টাঙানো ফোটোগুলোও ঝাড়া মোছা করা হয়েছে। আর বেশ কয়েকখানা নতুন ফোটো সাজানো হয়েছে। তারমধ্যে তিনটে বিদ্যা দীক্ষিতের ছবি। চন্দ্রা দেখেই চিনল ছবিগুলো। ভেনাস পার্কে তোলা দশ এগারো বছর আগের সেই ছবি। কখনো বোধহয় রঙের কাজ করা হয়েছিল, তাই এখনো জলুস আছে। ক্যামেরা-ট্যামেরাও জায়গা মতো রাখা হয়েছে।

...ও আসছে জেনেই ঘর সংস্কার করা হয়েছে। সকালে চন্দ্রা যে ওই ঘরে

ঢুকেছিল সেটা ভিখুও টের পায় নি, তাই মদন বিশ্বাসেরও জানার কথা নয়।

চন্দ্রার চোখে নিজেকে সুস্থ স্বাভাবিক দেখানোর জন্যেই এই মেহনত সেটা বুঝতে বাকি থাকল না।

চান সেরে ধপধপে পাজামা পাঞ্জাবী পরে পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ে মদন বিশ্বাস হাসি মুখেই ঘরে ঢুকল। ভিখু বলেছে দিদিমণি স্টুডিও ঘরে।

—কি ব্যাপার ম্যাডাম, সকাল বিকাল আমার বাড়ি হানা দিচ্ছ, জানলে তোমার ভদ্রলোকটি হার্ট ফেল করবে না তো?

চন্দ্রা ফোটো দেখছে। সেদিকে চোখ রেখেই জবাব দিলো, আমার ভদ্র-লোককে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না, আপাতত তোমাকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি।···এই ফোটাগুলি এবারের তোলা?

ঘরের বড় ইজিচেয়ারটায় গা ছেড়ে দিয়ে মদন বিশ্বাস হাতের সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। - হ্যাঁ, অনেক তুলেছিলাম, সেগুলো ডেভেলাপ করা হয় নি। এবারে বিন্ধ্য দীক্ষিতের ছবি ক'টার দিকে চোখ চন্দ্রার। বলে উঠলো, এগুলো আবার এখানে কবে টাঙালে, আগে তো দেখি নি।

—ছিল। টাঙিয়ে দিলাম···মাঝে মাঝে দেখতে মন্দ লাগে না।

চন্দ্রা হেসেই জিজ্ঞাসা করল, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে ইচ্ছে করে না? লোকটার স্মরণশক্তি প্রখরই আছে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে এই টিপ্পনী কেন। জবাব দিলো, নাঃ! তা তুমি সকালে একবার বিকেলে এক-বার ব্যাপারখানা কি?

—ব্যাপারখানা কি সে তো তুমি বলবে, ন'দশ দিন হয়ে গেল দেখা নেই কেন?

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মদন বিশ্বাস হালকা রসিকতার সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে নিয়ে জিতের রোগ সেরে গেছে?

—রোগ ধরা পড়লে আমার হাতে সারতে সময় লাগে না। তোমার যাচাই করে দেখার ইচ্ছে আছে?

মদন সচকিত একটু —তার মানে?

চন্দ্রা গম্ভীর। ইজিচেয়ারটার কাছে এগিয়ে গেল। সহজ সত্যের ওপর ঢের বেশি আস্থা, ঢের বেশি নির্ভর তার। যতই চান করে ফিটফাট হয়ে আসুক, মাত্র এই ক'দিনে শরীরের কি হাল হয়েছে সেটা চন্দ্রা এক নজরে দেখে নিয়েছে। চোখ ভিতরে ঢুকে গেছে, দু'দিকের হাড় উঁচিয়ে আছে, সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে। লোকটার স্বাভাবিক হাবভাবের এই মুখোশ এক-টানে ছিঁড়ে দিলে প্রতিক্রিয়া বেশি হবে বটে, কিন্তু বিশ্বাস, কাজও তাতেই হবে।

গম্ভীর দু'চোখ তার মুখের ওপর রেখে জিগ্যেস করল, ডাক্তার হিসেবে তুমি আমাকে কি ভাবো ?

মদন বিশ্বাসের চোখে সন্দেহের চকিত ছায়া তবু রসিকতা করেই জবাব দিলো, খুব লোভনীয়, শুধু আমি কেন, সব ছেলেরাই হয়তো তাই ভাবে, এ জন্যেই জিতবাবুর অত রাগ।

চন্দ্রা শুনেও শুনল না। যে ব্যক্তিত্বের ঘায়ে অনেক সময় রোগীকে বশে আনতে হয় সেটাই প্রবল এখন। আর কয়েকটা মিনিটের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

—শোনো! একটা আঙুল তুলে দেয়ালে বিদ্যা দীক্ষিতের ফোটোগুলো দেখিয়ে দিলো।—ওই ছবি দেখতে ভালো লাগে যত খুশি দেখো, কিন্তু আমার থেকে আপনার জন তোমার আর কে আছে ? তোমার জন্যে আমি যত ভাবব যত করব—তা আর কে ভাববে ? কে করবে ?

চাউনি ধারালো হয়ে উঠেছে মদন বিশ্বাসের। চোয়াল দুটো এঁটে বসেছে। চন্দ্রার দু' চোখ তার মুখের ওপর স্থির। গলার স্বর শুধু ধারালো একটু।

—দেখছ কি ? আমার কথা বুঝতে পারছ না ? আমাকে গোপন করে তুমি ডক্টর যাদবের কাছে যাওয়া আসা করছ কেন ? আমার থেকে তোমাকে কে বেশি জানে চেনে বোঝে ?

হাতের জ্বলন্ত সিগারেট আঙুল থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এই চোখ এই মুখ আর স্বাভাবিক নয় একটুও। খোলস ছিঁড়েছে। রাগে কাঁপছে মানুষটা —ড্যাট্ স্কাউনড্রেল ব্লাডি সোয়াইন, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! আই উইল টিচ হিম এ গুড

লেসন, আমি তাকে নরকে টেনে নিয়ে যাব, বুঝলে ?

—বুঝেছি। বোসো।

—লীভ মি নাও—প্লীজ !

—বোসো ! এমন ধমক চন্দ্রা কোনো অতি বড় অবাধ্য রোগীকেও কখনো দিয়েছে কিনা জানে না।

মদন বিশ্বাস আবার সেই ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপছে হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

চেয়ারের হাতলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিলো চন্দ্রা। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়েও দিলো। তারপর ও দুটো সরিয়ে রেখে চওড়া ইজিচেয়ারের হাতলে বসল। উত্তেজনায় জোরে জোরে সিগারেট টানছে মদন বিশ্বাস একই সঙ্গে রাগে চেয়ারের মধ্যেই সরে বসার চেষ্টা।

এবারে একটু নরম করে চন্দ্রা বলল, আমার সব থেকে শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে তুমি এভাবে গালাগাল করলে, কিন্তু আমাকে বলে তোমার সব থেকে বড় উপকার তিনিই করেছেন এ তুমি শীগগীরই টের পাবে। চিকিৎসা উনি করবেন, কিন্তু এ চিকিৎসার আর একটা দিক আছে, যেটা আমি ছাড়া হবে না—

মদন বিশ্বাস কর্কশ স্বরে বলে উঠলো, চিকিৎসার আমার দরকার নেই, আমার কিছুই হয় নি। ভালো ঘুম না, মাথার যন্ত্রণা হয় তাই গেছলাম যদি কিছু সাহায্য করতে পারে, আর দরকার নেই, সময়ে এই সামান্য ব্যাপার আপনি সেরে যাবে !

চন্দ্রা আবার রুখে উঠলো।—সামান্য ব্যাপার হলে তুমি আমার কাছে না এসে তাঁর কাছে গেলে কেন ? দশ বছরেও যা সারল না তা আপনি সারবে কি না তুমি বুঝছ না ? দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, ভিখু !

দরজার আড়ালেই ছিল ভিখু। তাড়াতাড়ি গলা বাড়ালো।

চন্দ্রা হুকুম করল, এক গেলাস ঠাণ্ডা খাবার জল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের দ্বিতীয় লাইটটাও জ্বেলে দিলো।

ভিখু জল নিয়ে হাজির। ডিশ থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে চন্দ্রা বলল, খাও।

জলের গেলাস মদন বিশ্বাসের সামনে ধরতে সে আবার তেতে উঠলো, আমি জল খাব তোমাকে কে বলেছে ?

—আমাকে কারো বলার দরকার হয় না। ধর, না কি আমি খাইয়ে দেবো ? হাল ছেড়ে মদন বিশ্বাস গেলাসটা হাতে নিয়ে এক লম্বা চুমুকে খালি করে দিলো। গেলাসটা ফেরত নিয়ে নরম হাসিমুখে চন্দ্রা বলল, কেমন তেষ্টাখানা পেয়েছিল, দেখলে ?

মদন বিশ্বাস রাগে ফুঁসছে তখনো, কিন্তু নিষ্কৃতি পাবার উপায়ও যেন দেখছে না। বলে উঠলো, আমার সে-রকম কিচ্ছু হয় নি, কিচ্ছু না। কেন তুমি তিলকে তাল করছ ?

চন্দ্রা আবারও ওই চেয়ারের হাতলে বসল। মোলায়েম করে বলল, তোমার খুব বিশেষ বা সাংঘাতিক কিছু হয়েছে আমিও বলছি না, কিন্তু যেটুকু হয়েছে তার জন্য সবার আগে আমাকে দরকার, তারপর হয়তো ডক্টর যাদবকে—

মদন বিশ্বাস ফুঁসে উঠলো—আর আমি ওই লোকটার মুখ দেখব !

—দেখবে। আমি দেখাব। তোমার কোনো রকম অসুবিধে হবে না।

—আর তুমি কি করবে ? রাগের চোটে বিদ্রূপই করে উঠলো মদন বিশ্বাস, তোমার চেম্বারে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে গপ্প-সপ্প করে রোগ সারাবে ?

চন্দ্রা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। ঠোঁটে আর চোখেও যেন হাসির ছোঁয়া লাগল। বলল, পারলে খারাপটা কি, দরজা তো বন্ধই থাকবে, তোমার অত লজ্জা কিসের ?

—না না না ! কেন আমাকে বিরক্ত করছ ? আমার দরকার নেই, আমি যাব না !

তার চোখে চোখ রেখে চন্দ্রা এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। খুব ঠাণ্ডা আর খুব স্পষ্ট করে বলল, তুমি যাবে। কাল থেকেই যাবে।···তোমার নিজের মাকে যদি ভালোবেসে থাকো, তাহলে যাবে। আর আমাকে যদি সত্যিকারের বন্ধু ভাবো—তাহলে যাবে। আজ তোমার মা নেই—সেই সঙ্গে আমিও নেই যদি ভাবতে পারো তাহলে যাবে না। তোমাকে আমি

ভাবতে সময় দিলাম।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। এমন হঠাৎ বেরুবে ভিখু ভাবে নি। সে হকচকিয়ে গেল। চোখের ইশারায় তাকে ডেকে চন্দ্রা হন হন করে বাইরে চলে এলো। সোজা গাড়িতে। ভিখু এসে দাঁড়াতে চাপা গলায় বলল, আশেপাশের চেনা জানা কাউকে বলে রাখ, দরকার বুঝলেই তাকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠাবে।

চন্দ্রা নারায়ণ এবার জানে মদন বিশ্বাস তার কাছে আসবে। তার এত দিনের অভিজ্ঞতা বলছে, বাইরের যে খোলসটা সে আকড়ে ধরে বসে ছিল সেটা যখন ভেঙেছে, না এসে পারে না।

বাড়ি ফিরে জিত্‌কে সব বলেছে। না বললে এই নতুন রোগী দেখে সে আকাশ থেকে পড়বে। তাছাড়া একটা ব্যাপারে তাকে সতর্ক করে দেওয়াও দরকার। অনেক কালের বন্ধু হলেও এ রোগ নিয়ে কোনো রকম পল্‌কা ঠাট্টা তামাসা চলবে না তার সঙ্গে। সামান্য থেকে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া কিছু হতে পারে।

মদন বিশ্বাস স্বাভাবিক মেজাজের মানুষ নয় জিত্‌ সেটা বরাবরই জানে। হঠাৎ তার এমন গুরুতর রোগের কথা শুনে অবাক হবারই কথা। সে শুনল শুধু, কোনো রকম মন্তব্য করল না।

পরদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর মদন বিশ্বাস এলো। জিত্‌ তখন সামনের দিকের বারান্দায় বসে। আপিস থেকে সাধারণত সাড়ে চারটের মধ্যেই ঘরে ফেরে। কোণের চেম্বারে চন্দ্রার তখন রোগী দেখা চলছে। প্রত্যেক রোগীকে বিদায় দেবার সময় সে বাইরে এসে এদিকে লক্ষ্য রাখছিল, আর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্তও মদন বিশ্বাসকে না দেখে ভিতরে ভিতরে উতলা হচ্ছিল। এবারে তাকে দেখামাত্র হেসে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। বলল, লক্ষ্মী ছেলে!

মদন বিশ্বাসের পরনে আগের দিনের মতোই পাটভাঙা পাজামা পাঞ্জাবী। মাথায়ও তেল জল পড়েছে। শেভও করেছে। এদিক থেকে তারতম্য কিছু নেই। কিন্তু মেজাজ তিরিক্ষি। দুরন্ত দামাল ছেলেকে কলে ফেলে ধরে বেঁধে অবাঞ্ছিত কোথাও এনে বসিয়ে রাখলে যেমন হয়, সে রকম মুখ।

গোঁ ভরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

চন্দ্রা বলল, তোমরা কথাবার্তা বলো, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে ফ্রি হয়ে আসছি। আজ আর কোনো লম্বা কেস রাখি নি।

লম্বা কেস বলতে অ্যানালিসিসের কেস। সে রকম কেস যে আজ নেই সেটা জিত্‌ও লক্ষ্য করেছে। ঠাট্টার সুরেই বলে ফেলল, তোর কদরখানা দেখ্ তাহলে—

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর আগের দিনের সতর্কতার কথা মনে পড়তে বিব্রত মুখে তার দিকে তাকালো। চন্দ্রার মুখে হাসি দেখে স্বস্তি।

শেষ রোগীকে বিদায় দিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে চন্দ্রা ফিরল। মদন বিশ্বাসের মুখে তখন নতুন সিগারেট জ্বলছে। চন্দ্রা তার পাশে বসে পড়ে বড় দম ফেলল একটা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, দিনে ক'টা করে চলেছে আজকাল ?

মদন বিশ্বাসের মুখে অসহিষ্ণুতার ছায়া। জবাব দিলো না। আগের মতো সহজ বা স্বাভাবিক হবার চেষ্টাও নেই।

জিত্ বলল, এর মধ্যে তিনটে হয়ে গেল। এটা চার নম্বর।

–এত সিগারেট খাওয়া থেকেও চন্দ্রা তার স্নায়ুর তাড়না অনুমান করতে পারে। সিগারেট খাওযার বহব তার বাড়িতেও দেখে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, চা খাবে ?

—না।

—আর কিছু ?

—না !

—বা-বা, ধমকাচ্ছো কেন ?

ওর রাগ সমর্থন করার মতো করেই জিত্ বলল, ও তো বলছিল ওর কিছুই হয় নি, আগে যেমন ছিল তেমনি আছে, তোমরা বাড়িবাড়ি করছ—

এবারে পলকের রুষ্ট ইশারায় চন্দ্রা থামিয়ে দিলো তাকে। তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে মদন বিশ্বাসের হাত ধরে টানল।—ওঠো, ও-ঘরে বসে একটু গল্প সল্প করি। ওঠো না, ভালো লাগবে দেখো, ভালো যদি না

লাগে তো কাল থেকে আর এসো না।

মদন বিশ্বাস উঠে হন-হন করে কোণের চেম্বারের দিকে চলল। চন্দ্রা সে-দিকে পা বাড়িয়েও জিতের দিকে ফিরল। বলল, হাসপাতালে এসো আমার সঙ্গে, দেখবে শতকরা সত্তরজন রোগী বলছে তাদের কিছু হয় নি, মিছিমিছি ধরে আটকে রাখা হয়েছে, বুঝলে ? তোমারও কি ধারণা, কিছু না হলে আমি ছেড়ে ডক্টর যাদবও ওকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন ?

চলে গেল। চেম্বারে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

মদন বিশ্বাস টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে গুম হয়ে বসে।

টেবিলের ওপর ধপধপে সাদা শৌখিন টেবিল-ক্লথ পাতা। এক ধারের ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। সমস্ত মেঝেতে নরম গালচে বিছানো। দেয়ালে একটাই বড় রঙিন ছবি টাঙানো—ভার্জিন মেরী মায়ের কোলে মানব পুত্র যীশু। একজনের মুখে স্নেহ উপছে পড়ছে আর একজনের মুখে আনন্দ উছলে উঠছে। এখানে এসে বসলেই ভালো লাগার কথা। সকলেরই ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটুকুও যেন নাকচ করার চেষ্টা মদন বিশ্বাসের।

নিজের চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসল চন্দ্রা। সকালে হাসপাতাল থেকে ডক্টর যাদবকে টেলিফোনে সমাচার জানিয়েছে আর কি কি ওষুধ চলছে জেনে নিয়েছে। জিজ্ঞেস করল, আজকের ওষুধ ঠিক ঠিক খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—কেমন লাগছে ?

—ভালো না।

—কাল রাতের ওষুধ খেয়েছিলে ?

—মনে নেই !

—ঘুম হয়েছিল ?

—ঘুম পাচ্ছিল। ঘুম হয় নি

—আচ্ছা, তোমার সব ওষুধ আমি ভিখুকে বুঝিয়ে দিয়ে আসব—এবার থেকে সে দেবে।

—আমি নিজেই পারব।

—না পারার কি আছে,তোমার বন্ধু জিত্‌ও পারে, কিন্তু কখনও কোনো ওষুধ নিজের হাতে সময় করে খায় না, এ-জন্যেই দায়িত্বটা আর একজনের ঘাড়ে চাপানো ভালো।

মদন বিশ্বাস এবারে হাঁ-না কিছুই বলল না।

চন্দ্রার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।—এবারে ওঠো তো।

না বুঝে মদন বিশ্বাস তাকালো তার দিকে।

—বলছি উঠে দাঁড়াও।

বিরক্তির ছায়া এখনো মুখে এঁটে আছে। মদন বিশ্বাস উঠে দাঁড়াল। আঙুল তুলে নিজের দিকের পুরু গদি আঁটা ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে দিলো।

—ওইখেনে। সমস্ত শরীর যতখানি পারো ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়, যাও।

—লম্বা দু' পা ফেলে মদন বিশ্বাস ইজিচেয়ারে এসে বসল। অসহিষ্ণু হাত দুটো সিগারেটের প্যাকেটের খোঁজে পকেটে ঢুকল। চেয়ার ছেড়ে উঠে চন্দ্রা বলল, উঁহুঁ উঁহুঁ, এখন খানিক্ষণ সিগারেট নয়, তোমাকে বসতে কে বলেছে, শরীর ঢিলে করে চেয়ারে মাথা রাখো, আমি দুটো ধূপ জ্বেলে দিচ্ছি, দেখ কেমন মিষ্টি গন্ধ, সিগারেট খেতেই ইচ্ছে করবে না।

দুটো ধূপ জ্বেলে ধূপদানিতে রাখল। নিজের অগোচরে ইজিচেয়ারের গদীর ওপর মাথা রেখেছে মদন বিশ্বাস। খরখরে দু' চোখ চন্দ্রার মুখের উপর।

—এবারে বলো, সাদা আলো নিভিয়ে সবুজ আলো জ্বেলে দেবো? কোন্‌টা ভালো লাগবে?

তপ্ত গলায় মদন বিশ্বাস বলে উঠলো, কোনোটাই ভালো লাগবে না!

অন্য রোগী হলে চন্দ্রা কি করত বা বলত বলা যায় না। এই রোগীর বেলায় একটু মজাই করে বসল সে। হাসি চেপে দু'পা এগিয়ে সাদা আলোর সুইচটা টিপে দিলো।

ঘর অন্ধকার।

ইজিচেয়ারের পাশ থেকে হাল্‌কা হাসি শোনা গেল তার।—হয়েছে?

—কিন্তু এ-রকম অন্ধকার করে বসে থাকলে আমি লিখবই বা কি করে, তোমাকে দেখবই বা কি করে? সবুজ আলোটা জ্বালি, কেমন?

মদন বিশ্বাস নিরুত্তর। চন্দ্রা সবুজ আলো জ্বেলে দিয়ে নিজের চেয়ারটা তার দিকে আর একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। —তুমি গা ছেড়ে চোখ বুজে আগে আমার কথা একটু শুনে নাও।···আচ্ছা জোসেফ, কত ছেলেমেয়ে তো একজন আর একজনকে ভালোবাসে কিন্তু বিয়ে হয় না, ঘা খায় আরো কত লোক কত রকমের ধাক্কা খায়, কিন্তু কেউ কেউ সেটা সামলে উঠে স্বাভাবিক ভাবেই দিন কাটিয়ে দেয়, আবার কারো কারো ভিতরটা গুমরে তুমড়ে একাকার হয়ে যায়, এ রকম কেন হয় বলো তো ?

মদন বিশ্বাস ওর দিকে চেয়ে আছে। নিরুত্তর।

চন্দ্রা আবার বলল, এ-রকম হয় কারণ, কারো কারো সত্তা আগে থেকে অন্য কোনো কারণে বড় কিছু ঘা খেয়ে জখম হয়ে বসে আছে—যা সে জানেও না বা মনেও নেই। ওই জখম সত্তার ওপর আবার যখন ঘা পড়ে তখনই গণ্ডগোল। এই জখম কেন, এ যদি একবার ধরা পড়ে তাহলে কোনো গণ্ডগোল নেই।

মদন বিশ্বাস তেমনি অপলক চেয়ে আছে তার দিকে।

—এই জখমের হদিস পেতে হলে একজনকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে, আপনার জন ভেবে মনের সব চিন্তা সব ভাবনা সব কথা বলে যেতে হবে —সব—সব। এই করে একদিন দেখবে তোমার নিজের সাহায্যে আর যাকে বিশ্বাস করলে তার সাহায্যে সেই জখমের হদিস আপনা থেকেই সামনে এসে গেছে। তাই বলছি, আমি তোমার আপনার লোকই ছিলাম ···তবু এখন থেকে সব থেকে আপনার একজন ভাবতে হবে আমাকে— যাকে স-ব বলা যায়, আর সব কিছু বলতে ভালোও লাগে।

দু' চোখ চক চক করছে মদন বিশ্বাসের। ওকেই দেখছে। এই চাউনিটা খুব স্বাভাবিক নয়।

চন্দ্রা বলল, এবারে চোখ বুজে তুমি ভাবো, দেখ মনে কোন্ কথা আসছে, আর বলে যাও।

মদন বিশ্বাস এবারে কথা শুনল। চোখ বুজল। একটু বাদে বলল, চোখ বুজে কিছু ভাবতে চেষ্টা করলেই আমার মাথার মধ্যে ঝন-ঝন করে কি যেন বাজতে থাকে···ভাবতে পারি না।

—চন্দ্রা খাতা টেনে নিল।—কি রকম শব্দ ?

—একসঙ্গে অনেকগুলো বাজনার মতো, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার মুখে সিনেমার যেমন বাজনা বাজে, উঃ! আর পারছি না, সাদা আলোটা জ্বালো!

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি উঠে সাদা আলো জ্বেলে সবুজ আলো নিভিয়ে দিলো। মদন বিশ্বাসের সামনে এসে দাঁড়াল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি।

আরো এগিয়ে ঝুঁকে নিজের শাড়ির আচলে করে তার কপালের ঘাম মুছে দিলো চন্দ্রা। বলল, থাক, আজ আর নয়, আবার কাল।

তাকে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এলো। বারান্দার সামনের দিকে কেউ নেই। হাতে ধরে মদন বিশ্বাসকে সেখানে এনে সোফায় বসিয়ে বলল, আসছি—

ভিতরে ঢুকে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো ঘরে জিত্‌কে দেখতে পেল না। আবার বেরিয়ে আসতে দেখল সে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। কাছে এসে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, কি করছ ?

গম্ভীর মুখে জিত্‌ জবাব দিলো, দেখতেই তো পাচ্ছ। কেন ?

গলা খাটো করে চন্দ্রা বলল, অ্যানালিসিসের পর জোসেফকে একলা ছাড়া ঠিক হবে না—চলো, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

জিত্‌ বলল, আমার ভালো লাগছে না, মাথাটা ধরেছে, তুমি যাও।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা ঘরের দিকে চলল। চন্দ্রা ভুরু কুঁচকে দেখল। অবাকও একটু। লোকটা মদন বিশ্বাসের দিকেও না তাকিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

আর এক দিন।

চেম্বারে মদন বিশ্বাস ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে আছে। তার কাছেই আড়াআড়ি বসে চন্দ্রা তাকে লক্ষ্য করছে আর নোট্ করছে। জিগ্যেস করল, কি রকম জঙ্গল দেখছ ?

—খুব ঘন জঙ্গল। আর চারদিক থেকে কতগুলো ধোঁয়া এগিয়ে আসছে।

—রাত না দিন ?

—রাত। কিন্তু ধোঁয়াগুলো সাদা।

—বেশ, আর কি দেখছ?

—একটা মেয়েকে দেখছি, সামনের দিকে হেঁটে চলেছে, মেয়েটাও ধোঁয়ার মতো। চন্দ্রা নোট করে যাচ্ছে।—কি রকম দেখতে মেয়েটা, বিদ্যা দীক্ষিতের মতো?

—মুখ দেখতে পাচ্ছি না, ধোঁয়াটে—সামনের দিকে যাচ্ছে! ইস—ওটাকেও দেখতে পাচ্ছি!

—কোন্‌টাকে?

—সেই নেকড়েটাকে। জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে মেয়েটার পিছু নিয়েছে! উঃ, কি ভয়ংকর চিৎকার করে উঠলো, আলো জ্বালো?

দিনের পর দিন তিন মাস ধরে অ্যানালিসিস চলেছে কিন্তু চন্দ্রা ধরা-ছোঁয়ার মতো কিছু পাচ্ছে না। রোগীর অবস্থা স্পষ্টই খারাপের দিকে এখন। ওষুধ খেতে চায় না, ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সমস্ত রাত পায়চারি করে। কখনো চোখ বুজে এলে সেই বীভৎস স্বপ্নটা দেখে, সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে একটা বিকট সাপ মাথার কাছে ফণা তুলেছে, সাপের মুখ আর মাথাটা শেষে ওর নিজের মুখ আর মাথা হয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রা প্রোফেসার যাদবের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়মিত। সেদিন ডক্টর যাদব বলছিলেন, লোকটা আর একটু কম ইনটেলিজেন্ট হলে তোমার আমার দু'জনেরই সুবিধে হতো।

অ্যানালিসিস থামিয়ে তিন দিন শক্ দেওয়া হলো ডক্টর যাদবের নির্দেশে। তেমন কোনো ফল নেই। আবার তাঁর কথামত এক কোর্স সাবকিউটিনাস ইনজেকশনও দেওয়া হলো। কিন্তু যে-কে সেই।

মানুষটার রাগ বাড়ছে। আক্রোশ বাড়ছে। হাসপাতালে বা ডক্টর যাদবের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেই চিৎকার করে ওঠে, আমার কি-চ্ছু হয় নি, কি-চ্ছু না, কেন তোমরা এভাবে আমার যন্ত্রণা বাড়াচ্ছ? কেন?

এই এক রোগী আহার নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে চন্দ্রার। রাত জেগে বই পড়ে, নতুন কোনো ব্যবস্থার হদিস হাতড়ে বেড়ায়। ঘরে আলো জ্বললে জিতের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। এই একজনের বিশেষ কোনো মায়া দয়া দেখছে না

বন্ধুর জন্য। সামান্য ত্রুটিতে রাগ। ক্ষেপে উঠে বলে, আলো নেভাবে, না আমি অন্য ঘরে চলে যাব ?

আলো নিভিয়ে বই কাগজ-পত্র হাতে চন্দ্রা নিজেই অন্য ঘরে চলে যায়। জিতের এই গোছের অসহিষ্ণুতা বাড়ছেই লক্ষ্য করছে।

সেদিন সকালেই ডক্টর যাদবের কাছে ছুটল। ভিখু খবরে পাঠিয়েছে, স্টুডিও ঘরের সব-কিছু রাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করেছে মদন বিশ্বাস। ডক্টর যাদব এমনিতেই চিন্তিত ছিলেন, এ-খবর পেয়ে আরো চিন্তিত। ভিখুর জিম্মায় তাকে ও-ভাবে একলা ফেলে রাখা আর বোধহয় ঠিক হবে না বললেন। কিন্তু এতদিন পরেও কেন এ-রকম হচ্ছে সেটা চন্দ্রার কাছে যেমন দুর্বোধ্য, ডক্টর যাদবের কাছেও তাই। সেই প্রসঙ্গেই কথা তুললেন ডক্টর যাদব, তুমি বলছ ট্র্যান্সফারেন্স কমপ্লিট অথচ অ্যানালিসিস আর এগোচ্ছেই না···এটা কি-রকম ব্যাপার ?

চন্দ্রা জবাব দিলো, আমিও তাই ভাবছি স্যার।

—ট্র্যান্সফারেন্স কমপ্লিট এ তুমি বুঝলে কি করে ?

—আগে অ্যানালিসিস-এ বসতেই চাইত না মোটে, এখন আগের থাকতে এসে বসে থাকে, মাঝে একটা দুটো দিন বাদ দিলে ভয়ানক আপসেট হয়ে যায়—কাল বাদ দিয়েছিলাম, মনে হয় সে-জন্যেই ঘরের জিনিসপত্র ও-রকম ভাঙচুর করেছে। ট্র্যান্সফারেন্স ঠিক ঠিক না হলে এতটা ডিপেন-ডেন্স আসবে কেন ?

ডক্টর যাদব বললেন, এটাও ঠিক···আচ্ছা, আরো দু'চার দিন দেখ, আমিও একটু ভেবে নিই।

সেই বিকেলে চন্দ্রা দেখে মদন বিশ্বাস সময়ের বেশ আগেই এসে সামনের দিকের বারান্দায় ঝিম মেরে বসে আছে। রোগী ডাকা আর বিদায় দেবার ফাঁকে যতবার চোখোচোখি হয়েছে তার সঙ্গে, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মদন বিশ্বাস। তার ইচ্ছে স্পষ্ট, আর সব রোগীকে পত্রপাঠ বিদায় করে তাকে নিয়ে বসা হোক। অন্য দিন হলে চন্দ্রা এগিয়ে এসে হাসি মুখে দু'চার কথা বলে একটু ঠাণ্ডা করে যেত। কিন্তু আজ ইচ্ছে করেই এলো না, এমন কি দূর থেকে হাসলও না। তার আগ্রহ বা ঝোঁক আরো বেশি

যাচাই করে নেওয়ার ইচ্ছে।

যাচাই হয়েছে। যতবার চোখাচোখি হচ্ছে ততোবার যেন রাগে ফুঁসছে মদন বিশ্বাস।

সব রোগী বিদায় হয়ে গেলে ছ'টার পর চন্দ্রা মদন বিশ্বাসকে নিয়ে বসে। তখন আর মনোযোগে ছেদ পড়াব কোনো কারণ থাকে না। এমন কি এই এক ঘণ্টা টেলিফোনের রিসিভারটাসুদ্ধ নামিয়ে রাখে। শেষ রোগী বিদায় হতে চন্দ্রা পায়ে পায়ে সামনের বারান্দার দিকে এগলো। বাগানের দিকে চোখ পড়তে দেখল জিৎ গম্ভীর মুখে সেখানে পায়চারি করছে।··· অনায়াসে এই অসুস্থ লোকটার কাছে এসে বসতে পারত দুটো কথা বলতে পারত। কিন্তু এই রকমই হাবভাব তার আজকাল যেন দুনিয়াব লোক তার কাছে অপরাধ করে বসে আছে। ঘরের মানুষের এই আচরণেও চন্দ্রা ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ। কোনো কিছুর যদি গুরুত্ব বুঝত। কাছে আসতেই মদন বিশ্বাস এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাগে শুকনো মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

চন্দ্রা আল্‌তো করে জিগ্যেস করল, খুব রাগ হয়েছে?

জবাব দিলো না।

—আচ্ছা এবার এসো, সকলকে ছেড়ে না দিলে তোমার কাছে বেশিক্ষণ বসি কি করে?

মদন বিশ্বাস তবু গোঁ ধরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল। চন্দ্রা ঘড়ি দেখল, আজ এমনিতেই একটু দেরি হয়েছে, সাড়ে ছ'টা বাজে। আধ মিনিট খানেক অপেক্ষা করে আরো একটু বাজিয়ে দেখতে গেল। বলল, থাক তাহলে, আজ আর তোমার ও-ঘরে গিয়ে বসার ইচ্ছে নেই দেখছি।

এবারে অস্বাভাবিক রোষে মুখ ফেরালো মদন বিশ্বাস। বলে উঠলো, আজ কেন, আর কোনো দিনই ইচ্ছে নেই। ঘরের লোকের কাছে আমার সম্পর্কে রস করে সব বলা হয়, লজ্জা করে না তোমার আমাকে নিয়ে এ রকম ছেলে-খেলা করতে?

আকাশ থেকে পড়া মুখ চন্দ্রার।—আমি তোমার সম্পর্কে রস করে ঘরের লোকের কাছে সব বলি।···মানে জিতের কাছে?

—নাতো কি, আরো কেউ ঘরের লোক আছে তোমার? তাই ও ঠাণ্ডা করে বলল, ইজিচেয়ারে ঠিক রিল্যাক্স করার সুবিধে হচ্ছে না, তোর ডাক্তারকে বলে ঘরে একটা খাট পাতার ব্যবস্থা কর!

চন্দ্রার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো।—জিত্ বলেছে এ কথা? কবে বলেছে? কখন বলেছে?

—কাল সন্ধ্যায় আমার ওখানে গেছিল আমাকে দেখতে। আসলে ঠাণ্ডা করতে গেছল, আমি বুঝি না? রাগে মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে মদন বিশ্বাসের।

—তুমি আমার ইজিচেয়ারের হাতলে বসো, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও—প্রথম দিন সবুজ আলো না জ্বেলে ঘর অন্ধকার করে দিয়েছিলে, তারপর আঁচলে করে আমার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছিলে—আমাকে ভোলাবার জন্য তুমি কত করো—কি না জানে সে? তুমি না বললে কি করে জানে? ঠাট্টা করে আবার বলে এলো, ভাগ্যের জোর থাকলে এ রকম রোগী হওয়া যায়।

সামনের বাগানে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। চন্দ্রা আরক্ত মুখে সেদিকে তাকালো। জিত্ তখনো ওদিকেই পায়চারি করছে। দেখা মাত্র চন্দ্রার মাথায়ও যেন আগুন জ্বলল। না, ও জিতের কাছে কোনো সময় এইসব গল্প করে নি, কিন্তু এ ভাবে ও জানল কি করে? শুধু জানা নয় এই রোগীকে সে এ সব কথা বলেও এসেছে।

হঠাৎ একটা সন্দেহ যেন মুগুরের মতো ঘা দিলো তার মথায়। মদন বিশ্বাসকে বলল, এক মিনিট—

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার চেম্বারে এসে ঢুকল সে। চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। পিছনে আর একটা দরজা আর সব ঘষা কাচের জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে থেকে কিছু দেখার উপায় নেই, দ্রুত দরজার কাছে এগলো। দরজায় লাগানো ম্যাজিক আই-এ চোখ লাগালো। তারপরেই স্থির কয়েক মুহূর্ত। বাইরের সব কিছু দেখতে-পাওয়ার কথা।

চোখের পলকে নিঃশব্দে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে সেই ম্যাজিক-আইতে চোখ লাগালো। ভিতরের সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘরে এসেই আবার দরজা দুটো বন্ধ করল চেপে শব্দ না করে, কিন্তু

ছিটকিনি লাগালো না। এদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত আবার মদন বিশ্বাসের কাছে চলল। তারই ফাঁকে চাউনিটা একবার বাগানের দিকে ঝলসালো। দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জিত্ ফুল দেখছে।

মদন বিশ্বাসের কাছে এসে একটা হাত ধরে টানল, খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, এসো, আর রাগ করে না, ছেলের নাম করে বলছি আমি ও-সব কিছু বলি নি। এসো বলছি!

অবিশ্বাস সত্ত্বেও মদন বিশ্বাস না উঠে পারল না। তার চাউনি এখনো উদ্‌ভ্রান্ত।

হাত ছেড়ে এবারে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে চন্দ্রা তাকে চেম্বারের দিকে নিয়ে চলল, পিছনের বাগান থেকে এবারে আর একজনের চোখ যে এদিকে আটকেছে তা চন্দ্রা এখন নির্ভুল অনুমান করতে পারে।

মদন বিশ্বাসকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। এদিকের দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর তাকে ধরে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলো। সাদা আলোটা নেভালো। প্রায় বিশ পঁচিশ সেকেণ্ডের মতো ঘর অন্ধকার। সবুজ আলো জ্বালল। জোসেফ তার দিকেই চেয়ে আছে। দুটো চোখ অদ্ভূত চকচক করছে।

চন্দ্রা আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। ওকেই দেখছে। তারপর গা ঘেঁষে ইজিচেয়ারের হাতলে বসল। নিঃশব্দে তার বুকে গালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো খানিকক্ষণ। না এতটা আগে আর কখনো করে নি। তারপর যা করল তা তো করেই নি। বুকে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের গাল মদন বিশ্বাসের গালের ওপর রেখে ফিস ফিস করে বলল, আমি কক্ষনো কাউকে কিছু বলি নি, বুঝলে? বিশ্বাস করতে পারছ না?

নিশ্চল পাথরের মতো ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে মদন বিশ্বাস। জবাব দেবার শক্তি নেই যেন, স্নায়ুগুলো সব টান টান।

চন্দ্রা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর পায়ে পায়ে পিছনের দেওয়ালের দিক থেকে কিছু যেন আনতে গেল। তারপরই এক ঝটকায় ঘুরে চোখের নিমেষে পিছনের দরজা দুটো একসঙ্গে খুলে ফেলল।

ভীষণ চমকে দরজার ওধারে জিত্ ছিটকে তিন হাত দূরে সরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাও বাইরে। রাগে বিতৃষ্ণায় সমস্ত মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে।—

এই তুমি? এই? এই ? এই? এত অবিশ্বাস ? তুমি এত নীচ ! এত ছোট!

বিমূঢ় মুখে মদন বিশ্বাসও চেয়ার ছেড়ে উঠে দু' পা এগিয়ে এসেছে !

কিন্তু চন্দ্রার এদিকে চোখ নেই। লোকটা দ্রুত ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে সেও অন্ধ রাগে সেদিকেই চলল। জিত্ এদিকের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মুখোমুখি দাঁড়াল।—আমি জানতে চাই কেন তোমার এত সন্দেহ ? কেন তোমার এত অবিশ্বাস যে দরজার ম্যাজিক-আই খুলে উল্টো করে লাগিয়ে রেখেছ ? বলতে বলতে মুঠো করে বুকের কাছে জামাটা ধরল।—কেন ? কেন ? কেন ?

হাতের টানে জামাটা ফ্যাঁস করে আধ হাতের ওপর ছিঁড়ে গেল।

এবারে জিতও ক্রুদ্ধ।—কেন সন্দেহ হবে না ? তুমি নিজেই তো স্বীকার করেছ সে-রকম দরকার হলে আর রোগী ভালো হবে বুঝলে তুমি তার বিছানায় রাতও কাটাতে পারো—স্বীকার করো নি ?

ও···! চন্দ্রার দু'চোখে রাগের সঙ্গে ঘৃণাও ঠিকরোচ্ছে।—লোকের বাক্স ঘাঁটা চাকরি করে এই চরিত্র হয়েছে তোমার ? এত অবিশ্বাস ! এত সন্দেহ ! হ্যাঁ, সেদিনও বলেছি পারি। আজও বলছি পারি ! এখন তুমি কি করবে? সেই লোভে রোগী হয়ে ওই ঘরে আসবে ?

জিতের মুখ আর এক পশলা দগ্ধ করে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো চন্দ্রা। চেম্বারে এসে ঢুকল আবার।

চেম্বার শূন্য। সেখানে কেউ নেই।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রা নিজের চেয়ারে বসল। শ্রান্ত, ক্লান্ত। কতক্ষণ কেটেছে ঠিক নেই। বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ কিছু মনে পড়তে চন্দ্রা সচকিত। তাড়াতাড়ি ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়াল করল। ওদিক থেকে সাড়া পেতে জিজ্ঞেস করল, হ্যালো, যাদব আছেন ? ···নেই?···কখন ফিরবেন?···ও, আচ্ছা ফেরা-মাত্র বলে দিও খুব দরকারে আমি চন্দ্রা নারায়ণ ফোন করেছিলাম।

রিসিভার রাখল। চিন্তাচ্ছন্ন। চিন্তা নয় ঠিক, গভীর উদ্বেগ। ঘরের মধ্যে অশান্ত পায়ে পায়চারি করল খানিক। মন বলছে, যা হয়ে গেল আজ, মদন বিশ্বাসের কোনো বড় রকমের ইমোশন্যাল ক্রাইসিসের মুখে গিয়ে

পড়। অসম্ভব নয়। বরং খুবই সম্ভব।

ঘড়ি দেখল! রাত প্রায় আটটার কাছাকাছি। কোথা দিয়ে এত সময় কেটে গেছে টের পায় নি। দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। তারপর এ-দিকের ঘরেব ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে, সেখানে জিত্ গুম হয়ে বসে আছে।

চন্দ্রা সামনে এসে দাঁড়াল। স্থিব, কঠিন।—শোনো।

জিত্ মুখ তুলে তাকালো।

—হিংসায় আর সন্দেহে আমার চেষ্টা তুমি কতটা পণ্ড কবে দিয়েছ জানো না। আর একটা লোককে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছ। আমি এক্ষুনি জোসেফের ওখানে চললাম, গিয়ে কি দেখব জানি না।···আমার সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে চা' তো এই রাতেই তুমি জোসেফের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, বুঝলে?

জিতেব সমস্ত মুখ বিবর্ণ, পাংশু।

তেমনি কঠিন সুরে চন্দ্রা আবাব বলল, যাবার আগে তুমি প্রোফেসার যাদবের ওখানে চলে যাবে, তিনি যদি না এসে থাকেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। আসা মাত্র তাঁর গাড়িতে তাঁকে জোসেফের ওখানে নিয়ে যাবে। বলবে, আমি বলেছি তাঁর যাওয়া খুব দরকার।

বেরিয়ে এলো। আর একটুও দেরি না করে ওষুধেব ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাংলো থেকে নেমে এলো।

গাড়িতে উঠলো! সশব্দে দরজা বন্ধ করে স্টার্ট দিলো।

মিনিট কুড়ির মধ্যে গাড়ি মদন বিশ্বাসের বাড়ির দরজায় থামল। বারান্দার আলো নেভানো। ভিতরের হল ঘরেরও। বাড়িটা নিঝুম।

পায়ে পায়ে চন্দ্রা আবছা অন্ধকার হলঘরে এসে দাঁড়াল। শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। তাছাড়া আর কোনো ঘরে আলো নেই। চন্দ্রা অস্বস্তি বোধ করছে কেমন। অস্ফুট স্বরে ডাকল, ভিখু—

পিছনে খট্ করে সুইচ টিপল কে, আলো জ্বালল। চন্দ্রা চমকে ঘুরে তাকালো। দেয়ালের গায়ে মদন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে। পরনে বিকেলের সেই পাজামাপাঞ্জাবী। হাত দুটো পিছনে। মুখে হাসি। কিন্তু দেখলে ভয় হয়

এমন হাসি। উদ্‌ভ্রান্ত লোলুপ চাউনি।

দেখামাত্র চন্দ্রা বুঝে নিল, ইমোশন্যাল ক্রাইসিসের চূড়ান্ত কিছুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

…জোসেফ!

—হ্যাঁ, ভয় পেয়ে গেছলে? ভিখুর খোঁজ কেন? এই রাতের মতো তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওই হাসি-গলা মুখের দিকে চেয়ে সর্বাঙ্গ কেমন শিরশির করছে চন্দ্রার। যতটা সম্ভব আত্মস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, অন্ধকারে ওখানে কি করছিলে? আরও যেন অপ্রকৃতিস্থ খুশির ঢেউ লাগল মুখে। বলল, একটু আগেও অন্ধকার ছিল না। তোমার গাড়ি আসছে টের পেয়ে অন্ধকার করা হয়েছে।…এখানে দাঁড়িয়ে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আর একটি মেয়ের ছবি দেখছিলাম…আজ তুমি আসবে জানতাম, তাই ছবি দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম।

এগিয়ে আসছে। হাত দুটো এখনো পিছনে। চন্দ্রা ভয়ে ভয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল। জোসেফের গলা দিয়েও যেন নিষ্ঠুর হাসি গলে গলে পড়ছে।—যে মেয়ের জন্য পনেরো বছর ধরে বুকের ভিতরটা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল—অথচ তোমরা কেউ জানো না—তার ছবি। তাকে দেখবে? দেখবে?

পিছনের হাত এবার সামনে এলো। চোখের সামনে ফটোটা যেন চন্দ্রার মাথায় মুগুরের ঘা বসালো একটা।

চন্দ্রারই ফোটো!

তেমনি হাসি গলানো লোলুপ চোখে চেয়ে থেকে জোসেফ হিসহিস করে বলে গেল, পনেরোটা বছর এই মেয়েকে আমি তোমাদের চোখের আড়ালে রেখেছি। বিদ্যা দীক্ষিতের মতো একটা থার্ড রেট শ্যালো মেয়েকে সামনে রেখে আমার ভিতরের ভদ্রলোকটাকে কবরের দিকে টেনে নিয়ে গেছি! এগারো বছর আগে ভেনাস পার্কে আমাকে জানান দিয়ে তোমরা সোহাগ-সফরে চলে যেতে যন্ত্রণায় পাগল হয়ে নিজের গলায় ব্লেড বসিয়ে ভিতরের কাঙালটাকে খতম করতে চেয়েছি। এতদিন ধরে তোমার এত চিকিৎসা

করে কোনো ফল পাচ্ছ না কেন এবারে বুঝেছ—?···আবার সেই হাসি।
—কার কাছ থেকে কার মন সরাতে চেষ্টা করছিলে তুমি? সে চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেকে আরো কত কাছে এনেছ সে যদি জানতে—যদি জানতে—
এবারে একটু শব্দ করেই হেসে উঠলো। দু' চোখের বীভৎস লোলুপতা চন্দ্রার চোখে মুখে ঠিকরে পড়ছে।
অব্যক্ত বিস্ময়ে আর ত্রাসে চন্দ্রার সর্বাঙ্গ অবশ। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দও বার করতে পাবছে না।
কঠিন দুটো হাত জানোয়ারের মতো অতর্কিত হ্যাঁচকা টানে তাকে বুকের ওপর টেনে আনতে চন্দ্রার হাত থেকে ওষুধের ব্যাগটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। আব সেই মুহূর্তে সম্বিতও ফিবল। কিন্তু ছাডাতে পারল না, নিজেব বুকের সঙ্গে ওকে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলার মতলব লোকটার। চন্দ্রা চিৎকার করে উঠতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরুলো শুধু—তার আগে হিংস্র মুখ আর দাঁত তার মুখের ওপর বসে গেল।
তারপরেই চন্দ্রা টের পেল সে আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, সাঁড়াশির মতো দুটো হাত তাকে বুকে আঁকড়ে শূন্যে তুলে নিয়েছে। আর লম্বা লম্বা পা ফেলে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।
শোবার ঘর। মদন বিশ্বাস শয্যার ওপর আছড়ে ফেলল ওকে। চন্দ্রার কাঁধের শাড়ি খসে মাটিতে। চোখের পলকে মদন বিশ্বাস ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিযে দিলো।
হাঁপাচ্ছে। হাসছে। দু' চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে আর লোভ ঠিকরোচ্ছে।
দিশেহারার মতো চন্দ্রা খাট থেকে নেমে শাড়ির আঁচল কাঁধে তুলে নিল।
—দরজা খোল বলছি! জোসেফ!
মরিয়া হয়ে নিজেই দরজা খোলার জন্য যোঝাযুঝি করতে লাগল।
—ছাড়ো! ছাড়ো বলছি! দরজা খোল!
জবাবে অসুরের শক্তি দিয়ে মদন বিশ্বাস ওকে আবার শয্যার কাছে ঠেলে নিয়ে এলো। তারপর আচমকা প্রচণ্ড একটা চড়ে চন্দ্রা মাথা ঘুরে আবার বিছানায়।
—আর তোমাকে ছাড়ব? সেই এক রাত থেকে লোভে উন্মাদ করেছে

তোমার ঘরের লোক—আমার কানে বিষ ঢুকিয়েছে—বলেছে, রোগী ভালো হবে বুঝলে তুমি তার বিছানায় রাত কাটাতে পারো, আর তুমিও শুনে বলেছ, পারি—বল নি? সেই লোভের বিষ কানে ঢোকার পর থেকে একটু একটু করে আমার ভিতরের পশুটা উন্মাদ পাগল হয়েছে—এত দিন যে ভদ্রলোক তার গলা টিপে রেখেছিল এবার সে তার গলা টিপে ধরেছে। তবু প্রাণপণে চেষ্ট করেছে ওই উন্মাদের হাত থেকে নিজে বাঁচতে, তোমাকে বাঁচাতে—কিন্তু তোমার প্রোফেসার ডাক্তার সেই উন্মাদ পশুকে আবার তোমার কাছেই ঠেলে দিয়েছে।...আজ নিজে সেধে অনেক কাছে এসেছিলে তুমি...বাট ফর দ্যাট্ সোয়াইন বেঁচে গেছলে...

চোখের পলকে চন্দ্রা আবার খাট থেকে মাটিতে নেমে পড়ল। অর্ধেক বসন মাটিতে লুটোচ্ছে। এমন ভয়াল বীভৎস হিংস্র মূর্তি চন্দ্রা জীবনে আর বুঝি দেখে নি। আবার ধরতে আসতে চন্দ্রা প্রাণপণ ধাক্কায় তাকে দূরে ঠেলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ছাড়ো বলছি!

—ছাড়ব। জোরেই হাসছে, আর এগিয়ে আসছে।—এর পরেও ছাড়ব তোমাকে? চন্দ্রা পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

সে এগোচ্ছে।—সাপ কখনো ফণা তোলার পর শিকার ছাড়ে? জঙ্গলের হায়না গন্ধ পেয়েও তার শিকার ছাড়ে?

আরো এগিয়ে আসছে।

চন্দ্রা পিছনে সরতে সরতে একেবারে শেষ প্রান্তে। আরো সরার চেষ্টা করতেই বুক সেল্‌ফের ওপরে বেতের ভাসটা মাথায় লেগে মাটিতে পড়ল। প্লাস্টিকের ফুল সামনে ছিটকে পড়ল, আর রিভলভারটা চন্দ্রার পাশে, মাটিতে।

দিশেহারার মতো চন্দ্রা সেই রিভলভার হাতে তুলে নিল। চেঁচিয়ে উঠলো, খবরদার। জোসেফ—আর এক পা-ও এগোবে না!

লোকটার বীভৎস হাসি।—এতটা এগোবার পরেও জোসেফ আর এগোবে না! এগোবে না?

—জোসেফ! আমি গুলি করব! জোসেফ!

রিভলভারসুদ্ধ উন্মাদ মানুষটা আবার আসুরিক শক্তি দিয়ে দু' হাতে

তাকে জাপটে ধরল। গলা দিয়ে হিস হিস করে আগুন ঝরছে, ওই দিয়ে তুমি আমাকে ভয় দেখাবে? ওই দিয়ে এতদিনের উপোসী জানোয়ারকে রুখবে তুমি?

আবার তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে বিছানার ওপর আছাড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রিভলভার তার বুকের সঙ্গে ঠেকে আছে ভ্রূক্ষেপ নেই।

—জোসেফ, সরে যাও! ছেড়ে দাও!

জবাবে হিংস্র লোলুপ এক অমোঘ অব্যক্ত গ্রাসের মধ্যে ডুবতে লাগল চন্দ্রা।

—জোসেফ!

তারপরেই কি যে হয়ে গেল চন্দ্রা জানে না। ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ একটা। ঘরের মধ্যে নয় এই বিছানাতেই যেন।

চন্দ্রা কি করেছে? এত ধোঁয়া কিসের?

তারপরই বুঝল কি হয়ে গেল।

চন্দ্রা ছিটকে বিছানা থেকে নেমে এলো। দু' চোখে দিশেহারা ত্রাস। জোসেফ পড়ে আছে। নিশ্চল নিস্পন্দ। তার বুকের রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে।

চন্দ্রা আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। কিন্তু হা করা মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরুলো না, হাতের উল্টো দিকটা শুধু মুখের ওপর উঠে এলো।

তারপর কোথা দিয়ে কি হয়েছে চন্দ্রা জানে না। এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে? জোসেফের বাংলো, কিন্তু জোসেফ কোথায়? সামনে জিত্। তাকে ধরে আছে।

—জিত্? তুমি? এখন তোমার অবিশ্বাস গেছে? তোমার সন্দেহ গেছে? এখন দেখলে আমি কত ভুল বলেছি—রোগী ভালো করার জন্য আমি যা পারি বলেছিলাম আমি তা মোটেই পারি না—দেখলে?

—চন্দ্রা হাসতে লাগল। দমকে দমকে হাসি। জিত্ তাকে থামাতে পারছে না। হাসি বাড়ছেই।

—আমি যা বলেছিলাম জিত্ আমি তা পারি না— এবার তোমার অবিশ্বাস গেছে, সন্দেহ গেছে ?

ওদিক থেকে ডক্টর যাদব ছুটে এসে তাকে ধরলেন।

তাঁকে দেখে চন্দ্রার হাসি মিলিয়ে গেল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো এবার—স্যার আপনি! আপনি এসেছেন? দু' হাতে তার দুই বাহু আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো।—রোগী ভালো করতে গিয়ে আমি তার কি করেছি দেখেছেন স্যার? নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি কি করেছি আপনি দেখেছেন? ওই হাসির মতোই আবার আর্ত কান্না। কাঁদতে কাঁদতে ডক্টর যাদবের পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ডক্টর যাদব ধরে ফেললেন। তাঁর মুখে ভাষা নেই। বিড়বিড় করে বলছেন, মাই ডারলিং···মাই ডারলিং···।